স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা।। ৮ এপ্রিল - ২০১৩।। ২৫ চৈত্র - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

প্রতিবেশী ভারত ও শ্রীলঙ্কা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

পঞ্চায়েতে সি পি এমের ছকটাই এবার হাইজ্যাক করেছেন মমতা □ গূঢ়পুরুষ □ ৯

সঞ্জয়কে রেয়াত করলে বাকিরা নয় কেন? □ তারক সাহা □ ১০

খোলা চিঠি : এপ্রিল ফুল করবেন কীভাবে? মুলায়ম সিংয়ের ক্লাসে যান □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

দেশবিরোধী অর্থনীতির কাণ্ডারী কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে যে কোনও আন্দোলনই জাতীয় আন্দোলন □ এন সি দে □ ১২

একটি ভুল থেকে আরেকটি □ ময়ূরী মুখার্জী □ ১৪

কলম্বো শাস্তি পেল, কিন্তু এখন কি হবে? □ কাঞ্চন গুপ্ত □ ১৬

মায়ানমারে বৌদ্ধ নীতি : দাঁতের বদলে দাঁত □ ১৮

নর্মদার সাধু □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২২

ক্ষমার আবেদন শুধু সমাজের সুবিধাবাদীদের জন্যই □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ২৭

কর্ণাটকের নির্বাচনে জাতপাত একটা বড় ফ্যাক্টর □ ২৯

সর্বশিক্ষা অভিযানে টাকার শ্রাদ্ধ : সারা দেশে প্রায় ১১ লাখ শিক্ষকের পদ খালি □ ৩০

প্রেরণাসিন্ধু ডাঃ হেডগেওয়ার □ সুকেশ মণ্ডল □ ৩১

যে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতের কথা প্রথম রেকর্ড হয় □ অরবিন্দ ঘোষ □ ৩৮

বলিউডের অধিকাংশ সিনেমাই গুরুত্বহীন— নাসিরুদ্দিন শাহ □ বিকাশ ভট্টাচার্য □ ৩৯

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃঃ ১৪-১৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ □ ঐতিহাসিক দুর্গ : ২১ □ □ বোধন : ২৩ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অঙ্গনা : ২৬ □ □ অন্যরকম : ৩৩ □ □ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪১-৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ২৫ চৈত্র, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ৮ এপ্রিল - ২০১৩

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.- Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যাই নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা

বিষয় : বাঙালির বর্ষবরণ

১৪১৯ পেরিয়ে ১৪২০, সূচনা হতে চললো বাঙালির আরও একটা নতুন ভোরের। কিন্তু আপন অস্তিত্ব জাহিরের ক্ষমতা কি আজ বাঙালির আছে? পাশ্চাত্য প্রভাবে আর অপসংস্কৃতিকে আত্তীকরণ করে বাঙালিয়ানা কি আজ বিপন্ন প্রজাতি নয়? পয়লা বৈশাখের হুজুগের মাঝেই স্বস্তিকা'র পাতায় এই প্রশ্ন তুললেন ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ, তথাগত রায়, সুমিত্রা ঘোষ, বিকাশ ভট্টাচার্য, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায়, সাধন কুমার পাল, রঞ্জিত রায় প্রমুখ। মননশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ রচনায় সমৃদ্ধ প্রতিটি লেখাই হয়ে উঠবে বাঙালির স্থায়ী সম্পদ।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পঞ্চায়েতি তরজা

রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষমতার মাপকাঠি লইয়া যে তরজা চলিতেছিল তাহা এখন আদালতে মীমাংসার জন্য গিয়াছে। প্রশ্ন হইল কেন এই তরজা? ইহার মূলে যাইতে হইলে বামফ্রন্ট রাজত্বে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষনের প্রবল দাপট সত্ত্বেও এ রাজ্যে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট বলে কোনও বস্তু ছিল না। বামফ্রন্ট সরকার ভোটকে একটি আর্টে পরিণত করিয়াছিলেন। পঞ্চায়েতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হাতে রাখিবার জন্য ২০০৩ সালে পৃথক একটি পঞ্চায়েত নির্বাচন আইন তৈরি হয়। এই আইনের ৪১ এবং ৪২ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে, ভোটের দিনক্ষণ স্থির করিবার অধিকার রাজ্য সরকারের। সরকারি মহলের বক্তব্য, আইনের বিধান মানিয়াই সরকার ওই সিদ্ধান্ত লইয়াছে। ২০০৩ সালের ওই পঞ্চায়েত নির্বাচনী আইনে অবশ্য ৪৩ (২) ধারায় বলা হইয়াছে, ভোটের দিন স্থির করিবার পূর্বে সরকারকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মতামত লইতে হইবে। সরকারি সিদ্ধান্ত অপছন্দ হইলে কমিশন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া নিজ মতামত জানাইতে পারিবে। কিন্তু কমিশনের সেই মতামত সরকার গ্রহণ না করিলে কী হইবে আইনে তাহা স্পষ্ট নয়। কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন, বামেরা নিজেদের হাতের মুঠোয় নির্বাচন কমিশনকে রাখিবার জন্য এই আইন প্রণয়ন করিয়াছিল। বিজেপি বলিয়াছে, পঞ্চায়েত নির্বাচন লইয়া যে আইন সিপিএম করিয়াছে, সেইটি বেআইনি। আজ হাইকোর্টে পঞ্চায়েত আইনের ৪২ নম্বর ধারার সাংবিধানিক বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছেন পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন দপ্তর। লক্ষণীয় এতদিন ৪২ ধারার বলেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন স্থির করিয়াছেন পূর্বতন সরকার এবং নির্বাচন কমিশনও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ওই পঞ্চায়েত আইনের কেউ কোনওদিন কখনও বিরোধিতা করিয়াছেন বলিয়া কোথাও শোনা যায় নাই। পূর্বের কোনও নির্বাচন কমিশনও ওই ৪২ ধারা লইয়া আপত্তি করেন নাই। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে ওই পঞ্চায়েত আইন সংবিধান বিরোধী জানিয়াও সকলেই মুখ বুজিয়া ছিলেন কোনও এক অদৃশ্য কারণে। পূর্বতন পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশনের কর্তারা বামফ্রন্ট সরকারকে খুশি করিতে এই অবৈধ আইনকে সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে পূর্বের এই আইন অনুসারী পঞ্চায়েত নির্বাচন কি অবৈধ ছিল? নির্বাচন কমিশনও ৪২ ধারায় বিলোপ চাহিতেছেন কেন তাহাই আশ্চর্যের। ২০০৩ সালে এই আইনে দুইটি পঞ্চায়েত ভোট হইয়াছে। পঞ্চায়েতের উপনির্বাচনও হইয়াছে। সাম্প্রতিক বিতর্কে কমিশনও যে সমস্ত চিঠি দিয়াছে, তাহা পঞ্চায়েতের ৪২ এবং ৪৩ ধারা উল্লেখ করিয়া। তাহা হইলে সেই কমিশনই এখন কেন ধারা দুইটিকে সংবিধান বিরোধী বলিতেছে? আজ অনেকেই রাজ্যে পরিবর্তনকে কটাক্ষ করিয়া থাকেন, কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলেই তো রাজ্য নির্বাচনী কমিশনার রাজ্য সরকারের টাকায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হইতে ভরসা পাইয়াছেন। আইনের মধ্যে ভূতকে প্রশ্রয় দিয়া এতদিন যে পাপ করিয়াছিলেন পূর্ব রাজ্য নির্বাচন কর্তারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন মীরা পাণ্ডে। রাজ্য সিপিএম দল এখন নিশ্চুপ হইয়া মজা দেখিতেছেন কারণ তাহাদের রাখিয়া যাওয়া দেনাও যেমন শোধ করিতে হইতেছে এই সরকারকে এবং তাহাদের সমস্ত অবৈধ পাপের পরিণতির দায়ভাগও বহন করিতে হইতেছে এই সরকারকে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু নতুন পথের দিশা দিতে পারিতেন। প্রত্যেকটি জেলায় একেক দিনে ভোট কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়া তিনি করাইতে পারিতেন। বিধানসভা ভোট যদি সাতদফা হইতে পারে পঞ্চায়েত ভোট ১৭ দফায় হইতে বাধা কোথায়? তিনিই দাবি করিতে পারিতেন রাজ্য সরকারের আর্থিক ভাঁড়ারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করুক রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এখনও সময় রহিয়াছে নিশ্চয়ই হাইকোর্টে এইসব প্রশ্নগুলি আলোচিত হইবে। নির্বাচন নিরপেক্ষ করিতে যাহা যাহা পদক্ষেপ প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করুক আদালত।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ওঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যস্থলে পৌঁচচ্ছ, থেমো না। জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। মহাতরঙ্গ উঠেছে। কিছুতেই তার বেগ রোধ করতে পারবে না।...উৎসাহ বৎস, উৎসাহ—প্রেম বৎস, প্রেম। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। আর ভয় কোরো না, সবচেয়ে গুরুতর পাপ—ভয়!

—স্বামী বিবেকানন্দ।

মাওবাদীদের হাতে চলে যাচ্ছে উচ্চ-প্রযুক্তির মার্কিন যন্ত্রপাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আমেরিকায় তৈরি অতি উচ্চ-প্রযুক্তির নাইট ভিশন ডিভাইস সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে ঝাড়খণ্ডের মাওবাদীদের হাতে। আর সেখান থেকে সারা দেশের মাওবাদীদের হাতে তা চলে যাচ্ছে। আর এ কাজে তাদের সাহায্য করছে একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানী। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে গোয়েন্দা রিপোর্টে। জানা গিয়েছে ঝাড়খণ্ড সরকারের লাইসেন্স জাল করে মূলত ব্যাঙ্গালোর কেন্দ্রিক ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থা

মাওবাদীদের কাছ থেকে আটক করা উচ্চপ্রযুক্তির মার্কিন যন্ত্রপাতি।

'অ্যালিগেটর ডিজাইনস প্রাইভেট লিমিটেড' যাদের একটি শাখা দিল্লীতেও রয়েছে। আমেরিকা থেকে তারা নাইট ভিশন ডিভাইস কিনছে এবং সেগুলি পৌঁছে যাচ্ছে মাওবাদীদের হাতে। গত বছরের আগস্টে বিহারের ঔরঙ্গাবাদ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ধার হওয়ার পর এই মারাত্মক তথ্য স্তম্ভিত করে দিয়েছে পুলিশ-প্রশাসনকে। এই অতি উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রটি দিয়ে গাঢ় অন্ধকারেও অন্তত ২০০ মিটার দূরবর্তী জিনিস অতি স্পষ্টভাবে গোচরে আসবে। এই অস্ত্র মাওবাদীদের হাতে পড়লে কেন্দ্র বা রাজ্যের প্রতিরক্ষাবাহিনীর দফা-রফা হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ওয়াকিবহাল মহল। কারণ এমনিতেই রাতের অন্ধকারে মাওবাদীরা যতটা স্বাচ্ছন্দ্য, ঠিক ততটাই অসুবিধে বোধ করেন প্রতিরক্ষাবাহিনীর জওয়ানরা। তার ওপরে রাতের অন্ধকারে জওয়ানদের অস্তিত্ব নাইট ভিশন ডিভাইস দিয়ে চিহ্নিত করা গেলে মাওবাদীদের ধরা দূরে থাক, জওয়ানদেরই প্রাণসংশয় হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে।

দেশের নিরাপত্তার পক্ষে ভয়াবহ বিপজ্জনক এই খেলায় নেমেছে যে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থাটি তাদের সম্বন্ধে এবং তাদের সঙ্গে মাওবাদীদের সম্পর্ক নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এন আই এ। ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের ধারায় এফ আই আর দায়ের ও বেআইন কাজকর্ম (প্রতিরোধ) আইনে সংস্থাটির বিরুদ্ধে মামলা সাজাচ্ছে এন আই এ। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার এহেন সংকটময় পরিস্থিতিতেও রাজ্য-কেন্দ্র রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি। ঝাড়খণ্ডের মুখ্য স্বরাষ্ট্রসচিব জে পি টুবিড সরাসরি অভিযোগ করেছেন, 'আমাদেরকে এব্যাপারে কিছুই জানানো হয়নি। এন আই এ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কোনও যোগাযোগই করেনি।'

কংগ্রেসের মুসলিমরা নিজেদের জন্য আলাদা টিকিট চাইছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কর্ণাটকের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের মুসলিম লবী নিজেদের জন্য আলাদা করে টিকিট চাইছে। রাজ্যের ২৮টি লোকসভা কেন্দ্রে

কে রহমান খান

কেন্দ্র পিছু অন্তত ১ জন মুসলিম প্রার্থী দাঁড় করাতে হবে বলে তারা দাবী জানিয়েছে। প্রাপ্ত সূত্র অনুসারে এই দাবীর পেছনে রয়েছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী কে রহমান খান, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি কে জাফর শরিফ, কংগ্রেসের নির্বাচনী অভিযান পরিচালন সমিতির নবনিযুক্ত প্রধান সি এম ইব্রাহিম-এর মতো হেভিওয়েট মুসলিম নেতারা। সম্প্রতি রাজ্যের মুসলিম নেতারা এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন এবং তাদের এটাই হলো সর্বসম্মত দাবী। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তাদের বার্তা হলো— রাজ্যের জনসংখ্যার ১৩ থেকে ১৪ শতাংশ মুসলিম। লিঙ্গায়েত ও ভোক্কালিগা-র মতো তাই তাদেরও ভোটব্যাঙ্ক রয়েছে। ২০০৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১৬ জন মুসলিম প্রার্থীর মধ্যে যে ৮ জন জয়লাভ করেছিল একথা তারা মনে করিয়ে দিতে ভোলেনি। অন্যদিকে ওবিসি গোষ্ঠীকে ৬৬টি টিকিট দেওয়া হলেও তারা জিতেছে মাত্র ১৮টি আসনে। রাজ্যের মুসলিমরা যে প্রথমে মুসলিম, পরে ভারতীয়— এই নীতিতে বিশ্বাসী, তাদের এই দাবীতে সেটাই প্রকট হয়ে উঠেছে।

প্রশ্নের মুখে জম্মু-কাশ্মীরের জঙ্গি পুনর্বাসন নীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সৈয়দ লিয়াকত আলি শাহের গ্রেপ্তারের পর প্রশ্নের মুখে পড়লো জম্মু ও কাশ্মীরের জঙ্গি পুনর্বাসন নীতি। গত ২৫ মার্চ জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এ ব্যাপারে সরাসরি

ওমর আবদুল্লা

তোপ দাগেন। তাঁর বক্তব্য লিয়াকত পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় আত্মসমর্পণ করতে আসছিল কিন্তু কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রকের আদেশে দিল্লী পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। আর এর পরিপ্রেক্ষিতেই উঠছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যাকে 'গ্রেপ্তার' করেছে, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সেই জঙ্গির পক্ষে 'আত্ম-সমর্পণে'র যুক্তি খাড়া করতে চাইছে কেন জম্মু- কাশ্মীর সরকার? এমনিতে গত চার বছরে পুনর্বাসন নীতির সুযোগ নিতে নেপাল হয়ে ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছিল যে ২৪১ জন প্রাক্তন জঙ্গি তাদের অবহেলা করার অভিযোগে জম্মু-কাশ্মীর সরকার ইতিমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত। সুতরাং 'আত্মসমর্পণ'কারীদের প্রতি সরকারের উদাসীনতা নতুন নয়। এখন প্রশ্ন, গ্রেপ্তার হওয়া কুখ্যাত জঙ্গি লিয়াকত আলির ব্যাপারে 'আত্মসমর্পণে'র তত্ত্ব খাড়া করে প্রকারান্তরে জঙ্গি আন্দোলনকেই কি সমর্থন করছেন না ওমর? তার চেয়েও বড় কথা জম্মু-কাশ্মীরে যে জঙ্গি পুনর্বাসন প্রকল্প মহা-সাড়ম্বরে গৃহীত হয়েছিল, ওই রাজ্যের সরকারের অসদুদ্দেশ্যে প্রণীত সেই প্রস্তাবটির বাস্তবায়নই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

জঙ্গি পুনর্বাসন নীতির খতিয়ানটা এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। এখনও পর্যন্ত এই নীতির অন্তর্গত ১০৮৯টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১৯১ জনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে, বাকিগুলি এখনও পরীক্ষণীয়। ২০১০-এ ২৯ জন প্রাক্তন জঙ্গি ফেরত আসে। এর মধ্যে পাঁচজন আসে পরিবার সমেত। ২০১১-য় ৫৪ জন প্রাক্তন জঙ্গি অবৈধ পথে ফেরত আসে। এর মধ্যে ১৬ জন আসে স্ত্রী-সন্তান সমেত। ২০১২-য় ১৫০ জন (৯০ জন পরিবার সহ) প্রাক্তন জঙ্গি নেপাল হয়ে কাশ্মীরে আসে। ২০১৩-য় এখনও অবধি আট প্রাক্তন জঙ্গির তাদের পরিবারের সঙ্গে একত্রিত হবার সুযোগ হয়েছে।

জঙ্গি পুনর্বাসন নীতি যে আগাগোড়াই

ধৃত জঙ্গি লিয়াকত আলি (মাঝে)।

ঝুঁকিপূর্ণ তা সব বিশেষজ্ঞই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। এখন এই প্রকল্পের মদতদাতা ওমর আবদুল্লা সরকারের এর পরবর্তী পর্যায়ে এনিয়ে নিস্পৃহ মনোভাবে (উল্লিখিত পরিসংখ্যানে যা স্পষ্ট) কিছু সন্দেহ দানা বাঁধছে। যেমন সরকার কি বেছে বেছে সেইসব জঙ্গিদেরই পুনর্বাসন দিতে চাইছে যাদের পুনরায় জঙ্গিপনায় ফেরত আসার সম্ভাবনা রয়েছে? বাকি যারা জঙ্গিপন্থা ত্যাগ করে সুস্থ জীবনে ফিরতে চাইছে, তাদের প্রতিই কি উদাসীন সরকার? ওমর গত ২৬ মার্চ জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় যে তথ্য দিয়েছেন তা হলো ১৯৯০ থেকে এখনও পর্যন্ত ৪,০৮১ জন জঙ্গি আত্মসমর্পণ করেছে রাজ্যে এবং এদের মধ্যে ২১০ জনকে আর্থিক সহায়তাদান করা হয়েছে। মজার কথা, এর মধ্যে ২০০ জন প্রাক্তন জঙ্গি ২০০৪-এর নয়া আত্মসমর্পণ নীতির বলে আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছে। আর বাকি ১০ জন ১৯৯৭-এর আত্মসমর্পণ নীতি অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০০২ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে ছিলেন পিডিপি-র মুফতি মহম্মদ সঈদ। সরকারি সূত্রের খবর, সঈদের আমলে ৩৩০ জন জঙ্গি আত্মসমর্পণ করে। বর্তমানে ৪৩২টি আবেদন নথিভুক্ত হয়েছে যার মধ্যে ৩৫৪টিই চ্যালেঞ্জের মুখে, ৯টি চিহ্নিত করা যায়নি এবং ৫৯টির এখনও তদন্ত চলছে।

রামমন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী 'বিজয়মন্ত্র' জপ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুজরাটের আমেদাবাদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত 'হিন্দু সঙ্গম'-এর বিশাল কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহন ভাগবত 'যুগপুরুষ' স্বামীজীর জীবনীসম্বলিত একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন— "শীঘ্রই আমরা রামমন্দির নির্মাণের লক্ষে গণজপ (রামনাম জপ) কার্যক্রম গ্রহণ করবো। একে আমরা 'বিজয়মন্ত্র' বলছি। এখন আমাদের ভাল, সৎ ও সত্যবাদী হিন্দুর প্রয়োজন। কারণ সমগ্র বিশ্ব হিন্দুদের দিকেই চেয়ে আছে।" তিনি ঘোষণা করেন— ১১ এপ্রিল থেকে ১৩ মে সারা দেশে বিজয়মন্ত্র জপ কার্যক্রম চলবে অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন হিন্দুভাষা ও হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এখন আমাদের প্রয়োজন শুদ্ধ হিন্দুজীবনমূল্য ও হিন্দুজীবন পদ্ধতি গ্রহণ করা।

আমাদের হিন্দু ভাবধারা সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রাকেও সঠিক দিশা দান করবে--- এ বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন।

কালিয়াচক ক্রমশ দুষ্কৃতীদের দখলে চলে যাচ্ছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ জেলার কালিয়াচক থানা এলাকা ক্রমশ দুষ্কৃতিদের দখলে চলে যাচ্ছে অথচ পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার। গত ১৪ মার্চ রাত্রি ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত কালিয়াচক থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে থাকা ডাঃ দিবস সিনহার বাড়িতে পর পর ৮-১০টি বোমা ফেলে পালিয়ে যায় একদল দুষ্কৃতি। সেই সময় বাড়ির লোকজন পুলিশকে ফোন করলেও পুলিশ অজ্ঞাত কারণে সেই সময় সেখানে উপস্থিত হয়নি। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ২০৯১ সালে ডাঃ দিবস সিনহা ও দীপালি সিনহা তাদের বসত বাড়িটি রেজেস্ট্রি করে কিনে নেন। কিন্তু জমিটির তিন কাঠা জায়গা রেকর্ড হয়নি। যদুপুরের ইব্রাহিম শেখ ও তার দলবল হঠাৎ এই জমি তাদের বলে দাবী করে এবং গভীর রাতে মুড়ি মুড়কীর মতো বোমা ফাটিয়ে বাড়ির পাঁচিল ও গোয়াল ঘর ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। পরের দিন পুলিশ আসলে তাদেরকে জমির কাগজপত্র দেখানো হয় এবং পুনরায় নিজেরা সেই পাঁচিল তৈরি করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এইভাবে রাতের বেলাতে দুষ্কৃতিরা থানার এত কাছে এতগুলি বোমা ফাটালো আর পুলিশ নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকল কেন? স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, পুলিশ টাকা পয়সা পেলেই দুষ্কৃতিদের সহায়তা করে। অভিযোগ হলো— কালিয়াচক থানার এস. আই রাম সাহার মদতে দুষ্কৃতিরা এই এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এবং অপরাধমূলক কাজ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই থানার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাতে ব্যাঙের ছাতার মতো মসজিদ, ঈদগা তৈরিতে প্রশাসন মুসলিমদের সাহায্য করছে। প্রকাশ্য দিনের বেলাতে রাস্তার ধারে গো-হত্যা করা হচ্ছে। থানাতে ডেপুটেসন দিয়েও কোনও ফল হয়নি। কালিয়াচক থানার আই সি-র নিষ্ক্রিয়তায় সুজাপুর থেকে অপহৃত এক ছাত্রীকে চার মাস পার হয়ে গেলেও তার পরিবার উদ্ধার করতে পারেনি। হিন্দুদের জমি দখল করে সেখানে নমাজ পড়া হচ্ছে। আসলে পরিবর্তনের সরকার আসার পর থেকে লাগামছাড়া তোষণের পরিণামস্বরূপ কিছু মুসলিম বেপরোয়া হয়ে গেছে। অবশ্য হিন্দুরাও মোকাবিলায় জোটবদ্ধ হচ্ছে।

ওবামা প্রশাসন যোগ শিক্ষাকে উৎসাহ দিচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ওবামা প্রশাসন শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য স্কুলগুলিতে প্রাচীন ভারতীয় অনুশীলন 'যোগ' চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। গত সপ্তাহেই হোয়াইট হাউস জানিয়েছে যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও তাঁর স্ত্রী মিচেল ওবামা এবার ঐতিহ্যগত ইস্টার এগরোল ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে শিশু ও তাদের বাবা-মা'দের জন্য 'যোগগার্ডেন' উদ্বোধন করবেন। আমেরিকার কর্মব্যস্ত নাগরিক ও তাদের বাচ্চাদের বলা হয়েছে, যোগ অনুশীলন করে স্বাস্থ্যবান ও বলবান হয়ে নিজেরা তৈরি হও। ইস্টার উপলক্ষে এই প্রথম ওবামা প্রশাসন 'যোগগার্ডেন' চালু করলেন তা নয়, বরং এবছরের উদ্যোগটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ক্যালিফোর্নিয়ার স্কুলে যোগশিক্ষার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। তাদের অভিযোগ ছিল— যোগের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম প্রচার করা হচ্ছে। আদালত যোগের পক্ষে রায় দেওয়ায় আনন্দপূর্ণ পরিবেশও ছিল।

হোয়াইট হাউস আরও মনে করে, শিশু সমেত আমেরিকার নাগরিকদের পেশী ও স্নায়ুর উপর চাপ বাড়ায় তাদের ভাল করার উৎসাহ কমে যাচ্ছে ও চিকিৎসার খরচ বাড়ছে। এইরকম পরিস্থিতিতে ওবামা প্রশাসনের যোগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও সক্ষমতা অর্জনের প্রচার খুবই প্রশংসনীয়। উল্লেখ্য, মিচেল ওবামাও একজন যোগের অনুরাগী। ২০০৯ সালে দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা এরকম 'যোগ গার্ডেন' শুরু হয়েছে, যা এখনও চলছে। এগুলিতে অনেক পরিবার তথা শিশুরা যোগ অনুশীলন করছে। নামমাত্র দামের সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এভাবেই ধাপে ধাপে আমেরিকার মানুষের মধ্যে যোগ অনুশীলনের প্রচেষ্টা প্রশাসনের তরফ থেকে চলছে। সাধারণ মানুষও আগ্রহভরে তা গ্রহণ করছেন। হোয়াইট হাউসের কথায় আমেরিকায় ভারতীয় যোগ অনুশীলন বিশ্বে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

পঞ্চায়েতে সিপিএমের ছকটাই এবার হাইজ্যাক করেছেন মমতা

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তর জলঘোলা করা নিয়ে অনেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুষছেন। তাঁকে অস্থিরমতি আত্মগর্বী নেত্রী বলছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। বাস্তবে তিনি ঠিক এর উল্টো। রীতিমতো ছক কষেই তিনি পঞ্চায়েত ভোট পিছোতেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংঘাতে গেছেন। উদ্দেশ্য ছিল, বিষয়টি আদালতে ঠেলা। একবার আদালতে গেলে মামলার ফয়সালা হতে বেশ কয়েক মাস সময় পাওয়া যাবে। ফলে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই মমতার বশংবদ আমলারা জাঁকিয়ে বসবেন। আমলাদের রাজনৈতিক পরামর্শ দেবেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা নেত্রীরা। ঠিক এইভাবেই সিপিএম রাজ্যের থানা-পুলিশ-প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতো। মমতা সিপিএমের দেখানো পথেরই পথিক। শিষ্যা এখন গুরুমারা বিদ্যা শিখেছে। মমতা হাতে সময় চাইছেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস চলতি বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে লোকসভার অকাল নির্বাচন হতে চলেছে। তাই তার আগে পঞ্চায়েত নির্বাচন হলে দলের মধ্যে গোষ্ঠী লড়াইতে তৃণমূল সংগঠন দুই বা তিন টুকরো হয়ে যাবে। সেই প্রতিবন্ধী সংগঠন নিয়ে লোকসভার নির্বাচনে ভাল ফল করা অসম্ভব। তৃণমূল দলের সাংগঠনিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রতিটি আসনে দলীয় প্রার্থীকে হারাতে গোঁজ প্রার্থী দেওয়াটা নিশ্চিত।

এই কথাটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুকুল রায়েরা ভালভাবেই জানেন। তাই তাঁরা বিকল্প রাস্তাও বেছে রেখেছেন। যেমন, কোনও কারণে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আইনি জটিলতা কেটে গিয়ে এপ্রিলের শেষে অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ভোট করা হলে তখন দলের কৌশল কী হবে। সেক্ষেত্রে তৃণমূল নেতৃত্বের টার্গেট হচ্ছে তপশিলীভুক্ত জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতে বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে না দেওয়া। এইসব সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে এস সি, এস টি এবং ওবিসি শংসাপত্র সরকারের কাছ থেকে নিতে হয়। রাজ্য

গূঢ়পুরুষের কলম

প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বলা আছে নানা ছলছুতোয় শংসাপত্র দেওয়াটা বিলম্বিত করতে হবে। নানা প্রশ্ন তুলে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষদিনটি পার করে দিতে হবে। শুধুমাত্র তৃণমূল দলের 'স্বীকৃত' মনোনয়নপত্র পাওয়া প্রার্থীকেই শংসাপত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। গোঁজ প্রার্থীরা যেন কোনওভাবেই সরকারি শংসাপত্র না পায় তা বিডিওদের দেখতে হবে। তৃণমূল দলের টার্গেট, কমপক্ষে ২০-২২ হাজার আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা। গত ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঠিক এইভাবেই সিপিএম পঞ্চায়েতের ১২ হাজার আসনে বিনা লড়াইতে দখল করেছিল। এই কারণেই মমতাকে এখন সিপিএমের স্কুলের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রী বলা হয়। সিপিএম যে কৌশলে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১২ হাজার আসনে বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেয়নি সেই একই কৌশল প্রয়োগ করে তৃণমূল দল ২৪ হাজার আসনে বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেবে না।

সংরক্ষিত আসনেই নয়, সাধারণ আসনেও বিরোধী প্রার্থীদের বিডিও অফিসে ঢুকতে বাধা দেবে তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকরা। প্রথমে বোঝানো হবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে লাভ নেই। নির্বাচনে খারাপভাবে হারতে হবে। তাতে কাজ না হলে বাড়িতে ঢুকে অল্পবিস্তর পেটাই দিলে মা বউয়ের কান্নায় বিরোধী প্রার্থীর নির্বাচন লড়ার ইচ্ছেটাই চলে যাবে। এরপরেও তৃণমূল বিরোধী দলের কিছু গোঁয়ার-গোবিন্দ প্রার্থী বিডিও সাহেবের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিলেও নানা ছোটখাটো ত্রুটি দেখিয়ে খারিজ করে দেওয়া হবে। এইজন্যই সম্প্রতি রাজ্যের সমস্ত বিডিওদের কলকাতায় ডেকে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সব কিছু ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যেসব 'বামপন্থী' বিডিও যথেষ্ট দায়িত্ববান নন তাঁদের বদলি করে দেওয়া হয়েছে অন্য কাজে। এটাও সিপিএমের রাজত্বের চেনা ছক। এই ছকেই সিপিএম এই রাজ্যে সাতবার পঞ্চায়েত নির্বাচন করিয়েছে। এই ছকে খেলেই বিমান বসুরা আজও রাজ্যের অধিকাংশ জেলা পরিষদ নিজেদের দখলে রেখেছেন। মমতা সেই ছকটাই এবার হাইজ্যাক করেছেন মাত্র। একটা কথা শুধু তাঁর চিন্তার বাইরে ছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনী লড়াইতে বাম-বিজেপি কাঁটা তুলতে পক্ষপাতে দক্ষ সেনাপতি চাই। অতীতে সিপিএম দলদাস সেনাপতি পেয়েছিল। সেই ভাগ্যটা এবার তৃণমূল নেত্রীর ভাল নয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মীরা পাণ্ডে দলদাসী হতে রাজি নন। তিনি অবাধ নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচন করাতে চাইছেন। এমন অবাস্তব গোঁ ধরে থাকলে রাজ্যের নেত্রী কিভাবে 'সোনার বাংলা' গড়বেন? গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মহাকরণ সবই ঘাসফুল মার্কা সবুজ পতাকায় ঢেকে না দিলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কীভাবে হবে!

এই সহজ সরল কথাটা মীরা পাণ্ডে মহাশয়া বুঝতে চাইছেন না। তবে কথায় আছে, একজন মহিলা অন্য মহিলার ছলাকলা যত সহজে ধরতে পারেন পুরুষ তা পারে না। হয়তো কথাটা মিথ্যা নয়!

সঞ্জয়কে রেয়াত করলে বাকিরা নয় কেন?

তারক সাহা

অস্ত্র আইনে সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় দত্ত-এর শাস্তি মুকুব করা নিয়ে সম্প্রতি দেশের নাগরিক সমাজের মতাদর্শ উলম্বভাবে দ্বিধাবিভক্ত। সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কাটজু এই বিতর্ককে আরও উস্‌কে দিয়েছেন রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের কথা বলে। সঞ্জয় দত্ত বা সঞ্জুবাবা যিনি এই নামেই বলিউডে খ্যাত, তাঁর পিছনে চিত্রপরিচালকরা ২০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই লগ্নী করে বসে আছেন। সঞ্জুবাবা যদি আরও সাড়ে তিন বছর জেলে কাটান তবে এই ২০০ কোটি টাকার কী হবে? সমগ্র বলিউড তৎসহ কিছু রাজনৈতিক নেতা সঞ্জুবাবার হয়ে তাই ব্যাট ধরেছেন।

এই আবেগপূর্ণ আবেদনের চুলচেরা বিচার প্রয়োজন। এটা ঠিক যে, ইতিমধ্যেই দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে তাঁর। অনেক মানসিক ধকল কাটিয়েছেন তিনি। তাছাড়া তিনি বিবাহিতা, দুই শিশু সন্তানের জনক, নামজাদা শিল্পী, সর্বোপরি, সুনীল-নার্গিসের পুত্র। এতসব বিশেষণ থাকার সূত্রে দেশের তাবড় ব্যক্তিবর্গ তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য আবেদন করছেন।

কিন্তু আইনের চোখে সবাই সমান। আচ্ছা, আজ যদি দাউদ ইব্রাহিম, টাইগার মেমনরা আত্মসমর্পণ করে আবেদন জানায় যে, (১৯৯৩ সালে যাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে দুই শতাধিক মানুষ নিহত) তাদের ভুল হয়ে গিয়েছে, তাদের ক্ষমা করা হোক তবে আইন কি তাদের ক্ষমা করে দেবে?

বিচারপতি কাটজু বলেছেন যে, টেকনিক্যালি সুপ্রীম কোর্ট ঠিকই বিচার করেছে, তবুও সঞ্জয় যখন ভুল শুধরে নিয়েছে তাহলে তাঁকে ক্ষমা করা যেতে পারে। প্রশ্ন হলো, অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতি কীভাবে এমন কথা বলতে পারেন? সঞ্জুবাবার অপরাধ অনেক গর্হিত। তিনি শুধু একে ৫৬ গ্রেনেড, কার্তুজ নিজের কাছে রাখেননি, তাঁর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল মুম্বাই বিস্ফোরণের মূল পাণ্ডাদের সঙ্গে। আর মারাত্মক অস্ত্রগুলি তাঁকে জোগান দিয়েছে এইসব পাণ্ডাদের লোকজনরা, সঞ্জয় আদালতে তা স্বীকারও করেছেন।

এতবড় ঘটনাকে কীভাবে আদালত লঘু করে দেখবে? বে-আইনি অস্ত্র কারুর হেফাজতে রাখা আইনগত অপরাধ, সুতরাং সেই অপরাধে দণ্ডিত সে। মুম্বাই বিস্ফোরণের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না বলেই আদালত তাঁকে 'টাডা' আইন থেকে মুক্তি দিয়েছে, নইলে তো সারাজীবনই তাঁকে জেলেই পচতে হোত। তাছাড়া সঞ্জয়কে ক্ষমা করা হলে এমন বহু আবেদন আসবে অন্য দণ্ডিতদের কাছ থেকেও। ইতিমধ্যে এমন একটা আবেদন এসেছে জৈবউন্নেসা আনোয়ার বাজি নামে ৭০ বছর বয়স্কা এক দণ্ডিতের কাছ থেকে। সঞ্জুবাবার চেয়ে বাজির বিষয়টা মানবিকতার খাতিরে অনেক বেশি সংবেদনশীল। কারণ কাজির বয়স ৭০ এবং তার কিডনিতে টিউমার রয়েছে।

সংবিধান কি বলছে

বিচারপতি কাটজু সঞ্জয়কে প্রথমে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের কাছে এবং তা প্রত্যাখ্যাত হলে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদনের পরামর্শ দিয়েছেন যথাক্রমে অনুচ্ছেদ ১৬১ (রাজ্যপাল) এবং ৭২ (রাষ্ট্রপতি)। কী বলছে ওই দুই ধারায় :

অনুচ্ছেদ ১৬১-তে বলা হয়েছে : কোনও রাজ্যের সীমার মধ্যে কোনও অপরাধ ঘটলে সংশ্লিষ্ট অপরাধের অপরাধী তার সাজা হ্রাস বা ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদন করতে পারে। অনুচ্ছেদ ৭২-র বক্তব্য অনুচ্ছেদ ১৬১-র মতোই কেবল রাজ্যপালের জায়গায় পড়তে হবে রাষ্ট্রপতি। দুই সাংবিধানিক শীর্ষ কর্তাব্যক্তিদের ক্ষমতার ফারাক শুধুই একজায়গায় এবং সেটা হলো মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামীর ক্ষেত্রে।

রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি কী করবেন

সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা রিভিউ পিটিশন প্রত্যাখ্যাত হলে তখন সঞ্জুবাবাকে দ্বারস্থ হতে হবে রাজ্যপালের দরবারে। এক্ষেত্রেও সঞ্জুবাবার রেহাই মিলবে কিনা তা কোটি টাকার প্রশ্ন। তার কারণ হলো :

(১) সঞ্জুবাবাকে রেয়াত করলে রেয়াত করার আবেদন বিবেচনা করতে হবে সেই ১০ জন যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের (যাদের মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিয়েছে উচ্চতম আদালত) যারা শীর্ষ আদালতের মতে সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষ, যারা শুধুমাত্র পয়সার লোভে বিভিন্ন স্থানে অস্ত্র ছড়িয়ে বিস্ফোরণের মতো এক ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ মামলার সঙ্গে যুক্ত। কোনও আসামীর শাস্তির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন কিনা যেখানে দণ্ড মাত্র সাড়ে তিন বছরের। আর যদি বা রাজ্যপাল তা করেন তবে তা দেশের বিচারব্যবস্থার ওপর হস্তক্ষেপ হবে। আর তাতে মনোবল ভাঙাতে পারে তামাম বিচারব্যবস্থা। (২) প্রশ্ন হচ্ছে কারা তবে ক্ষমার যোগ্য? সুতরাং রূপোলী পর্দায় সঞ্জুবাবা যতই খলনায়ক থেকে গান্ধী হবার যতই চেষ্টা করুক না কেন বাস্তবে ১৯৯৩ সালের 'খলনায়ক' আজও আইনের চোখে 'খলনায়ক সঞ্জুবাবা'।

এপ্রিল ফুল করবেন কীভাবে ?

মুলায়ম সিংয়ের ক্লাসে যান

মাননীয়
মুলায়ম সিং জি যাদব,
সুপ্রিমো, সমাজবাদী পার্টি

নেতাজি, নমস্তে। এই এপ্রিল মাসে বসে গত জুনের কথা মনে পড়ছে। সেই যে জুন মাসেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এপ্রিল ফুল করেছিলেন। মনে পড়ছে? পড়ছে না। মনে করিয়ে দিচ্ছি। আসলে ভারতীয় রাজনীতিতে আপনি এতবার এত জনকে এপ্রিল ফুল করেছেন যে তা মনে রাখা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

সেটা ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মরসুম। কংগ্রেস তখনও প্রণব মুখোপাধ্যায়কে প্রার্থী ঘোষণা করেনি। আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বৈঠক করে তারপর প্রেস কনফারেন্স করে সোজা মনমোহন সিংয়ের নাম ঘোষণা করে দিলেন আপনাদের পছন্দের প্রার্থী হিসেবে। আরও কয়েকটা নামও বলেছিলেন। কিন্তু কদিন পর যখন কংগ্রেস প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নাম জানালো তখন একেবারে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে সমর্থন দিয়ে দিলেন। কী মজাই না হয়েছিল। ওদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার ওপর ভরসা করে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে আছেন। আপনি নিশ্চয়ই সেই জুন মাসে 'এপ্রিল ফুল, এপ্রিল ফুল' বলে লখনউতে আনন্দ করছিলেন।

এরপর মনে আছে একবার একসঙ্গে অনেককে এপ্রিল ফুল করেছিলেন। মনে করাব নাকি দিনটা? সেই যে এফডিআই ইস্যু। মনে পড়ছে। কী বক্তৃতাটাই না দিয়েছিলেন লোকসভায় বসে। এখনও মনে আছে আমার। আপনি বলেছিলেন, গান্ধীজী বেঁচে থাকলে এমন বিপদ হতে দিতেন না। আর সেই গান্ধীজীর কংগ্রেস দেশকে খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের ছাড়পত্র দিয়ে বিক্রি করে দিতে চাইছে। মনে পড়ছে মুলায়মজি?

তারপর ভোটাভুটি হলো সংসদে। আর দেখা গেল সেদিন মনমোহন সিং সরকারকে বাঁচাতে সবার আগে এগিয়ে এলেন আপনি। সেদিন বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ বলেছিলেন, খুব আক্ষেপ করেই বলেছিলেন, গান্ধীজী আজ নেই কিন্তু মুলায়মজি থাকলেই এফডিআই নীতি পাশ করাতে পারত না সোনিয়া মনমোহনের সরকার।

যাইহোক, আপনার সেসব ডিগবাজির কথা লিখতে বসলে পাতার পর পাতা খরচ হয়ে যাবে। তবে ব্ল্যাক মেলের রাজনীতি যদি করতে হয় তাহলে আপনার কাছে শিখতে হবে। এখন তো আপনার খুব ভালো সময়। তামিল ইস্যুতে কেন্দ্রের থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের পর আপনার ২২ সাংসদের দল সমাজবাদী পার্টির ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে কংগ্রেস। আপনারাই তো প্রাণ ভোমরা ইউপিএ টুয়ের। আপনি সমর্থন না করলে কংগ্রেসের ক্ষমতা হারানোর ভয়। অন্যদিকে সমর্থন তুলে নিলে আপনার দলের সিবিআই ভয়।

এরই মধ্যে আবার কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী বেণী প্রসাদ ভার্মা আপনাকে ফের সুবিধা করে দিয়েছে। চাপ রাজনীতির অস্ত্র তুলে নিয়ে তিনি বলেছেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টি উত্তরপ্রদেশে চারটির বেশি আসন পাবে না সমাজবাদী পার্টি। এর আগে তাঁর মন্তব্যের জন্য সংসদে দাঁড়িয়ে মুলায়মজি আপনার কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল ইউপিএ চেয়ারপার্সন ম্যাডাম সোনিয়া গান্ধীকে। সেই বেণী আরও একবার বোমা ফাটালেন। বললেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে মাত্র চারটিতে জিতবে এসপি। ওই চারজন সাংসদই সমাজবাদী পার্টির শোকমিছিল বের করবেন। আপনারা আবার পদত্যাগের দাবি করেছেন। আপনার ছেলে শ্রীমান অখিলেশ পাল্টা বলেছেন সপা নয় মায়াবতীর বসপাই পাবে চারটি আসন। বেণী বা অখিলেশ লোকসভা ভোটের এত আগে থাকতে কেন রাজনৈতিক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হয়ে উঠলেন সেটা বুঝতে পারছি না। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। ভালোই বুঝতে পারছেন যে দুর্বল কংগ্রেসকে চাপে রাখার অনেক বড় সুযোগ এনে দিয়েছেন বেণী। এমনিতেই মুলায়ম চাপে দিন কাটে মনমোহন সিংদের। এর ওপর আরও চাপ দেওয়ার সুযোগ আপনি নিশ্চয়ই কাজে লাগিয়ে নেবেন। আপনার সমর্থন যে বড্ড দরকার ওদের।

মাঝে মাঝেই হুঙ্কার দেবেন সমর্থন ওয়াপাস কর লেঙ্গে। কংগ্রেস হাতজোড় করবে। আপনি শর্ত দেবেন। দুনিয়া প্রশ্ন করবে। আপনি ছোট্ট হেসে বলে দেবেন, না না সমর্থন তুলবে না সপা। ওটা তো এপ্রিল ফুল করেছিলাম। আপনার এপ্রিল ফুল তত্ত্বের জয় হোক।

— **সুন্দর মৌলিক**

উত্তর সম্পাদকীয়

দেশ বিরোধী অর্থনীতির কাণ্ডারী কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে যে কোনও আন্দোলনই জাতীয় আন্দোলন

এন. সি. দে

২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ-সহ ১১টি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা সর্বভারতীয় ধর্মঘট হয়ে গেল। এই ধর্মঘট সর্ব অর্থেই ধর্মঘট, কারণ এর সঙ্গে অধর্মের কোনও যোগ নেই। বরং এই ধর্মঘট বিরোধিতা করাটাই অধর্ম, যে কাজটি করে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস ও তার সরকার। এই দলের নেতা ও নেত্রীবৃন্দ মুখে বলছে, 'এই জনবিরোধী কংগ্রেস সরকারকে একদিনও চলতে দেওয়া 'উচিত নয়', অথচ এই জনবিরোধী কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে নিজেরা তো লড়াই করছেই না, যারা লড়াই করছে তাদের বিরুদ্ধেই 'রণং দেহী' হুংকার ছাড়ছে। রাজনৈতিক নৈতিকতার শক্তি দিয়ে তারা এর বিরোধিতা করতে পারছে না, প্রশাসনিক পেশীশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে অসহায় সরকারি কর্মচারী ও স্ব-নিযুক্ত ক্ষুদ্র বেসরকারি দোকান-ব্যবসায়ী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

অধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত। তাই এ যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ। গীতায় বর্ণিত শ্রী ভগবানের বাণী অনুসারে এই যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধের বিরোধিতা করাতো বটেই; এমনকি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করাটাও অধর্ম। কিন্তু কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট কেন 'ধর্মযুদ্ধ'? সেই কথাটিই এখন প্রমাণ করার চেষ্টা করব।

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার যে জনবিরোধী তার সবচেয়ে সহজবোধ্য প্রমাণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। জীবনযাপনের সর্বস্তরে নিত্য-অনিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যয় আজ আকাশচুম্বী। ২০০৪ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে পণ্যমূল্য লাগামহীনভাবে বেড়েই চলেছে। সরকার দ্রব্য-মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণের কোনও চেষ্টাতো করছেই না, বরং নিজেও পেট্রল-ডিজেল, গ্যাস, কয়লা প্রভৃতি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পণ্যের দাম নিজেই বাড়িয়ে চলেছে। মনে রাখবেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আপনার আয়ের উপর থাবা বসায়। এটাও এক ধরনের ট্যাক্স, তবে পরোক্ষ। মানুষ বুঝতে পারে না। তবে বাজারের তাপ-উত্তাপের ভোগ সাধারণ মানুষকেই ভুগতে হয়।

কিন্তু কেন এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি? দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার কী সত্যিই অপারগ? না কী সপারগ! এই সত্যটি জানা দরকার, তাহলেই বোঝা যাবে কংগ্রেস সরকার কেবল জনবিরোধী নয়, দেশ ও জাতিবিরোধীও বটে। আসুন, কংগ্রেস সরকারের নীতি ও কৌশলগুলি একটু পর্যালোচনা করি। বিগত বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের অর্থনীতি ও শিল্পনীতি ছিল জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে চালিত। তাই বাজপেয়ি সরকার আর্থিক স্বনির্ভরতা বাড়াতে একদিকে FRBM Act করে বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, অন্যদিকে সরকারি কোষাগার সমৃদ্ধ করতে শিল্পোৎপাদন বাড়িয়ে রপ্তানী বাণিজ্য বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছিল। বিদেশী পণ্য আমদানীর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখায় দেশের বাজারকে বিদেশীরা কবজা করতে পারেনি। সেই কারণেই বাজার ছিল স্থিতিশীল, দ্রব্যমূল্য ছিল স্থির। সাম্রাজ্যবাদীরা স্বভাবগত ভাবেই জাতীয় স্বনির্ভরতা পছন্দ করে না; তাই তারা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল পাছে ভারত একটি আত্মনির্ভর

> **“আজকের বিদেশীরা এদেশে ব্যবসার ছাড়পত্র পেয়ে প্রথমেই ভাঙতে উদ্যোগী হয়েছে এদেশের সস্তাগণ্ডার বাজারকে। তাই তারা কংগ্রেস সরকারের সাহায্যে নানান অজুহাতে বাজারকে ঊর্ধ্বমুখী করে তুলছে। কখনও বলছে অনাবৃষ্টির জন্য দাম বাড়ছে, কখনও বলছে অতি বৃষ্টির ফলে এই দরবৃদ্ধি, কখনও বার্ড ফ্লু-র নাম করে লক্ষ লক্ষ মুরগী নিধন করে ২২ টাকা মুরগীর মাংসের দাম ৮৪ টাকায় তুলেছে।”**

জাতীয় অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়ে উঠতে পারে। এই কারণেই বিজেপি সরকার যাতে পুনর্বার নির্বাচিত হতে না পারে তার জন্য বিদেশীরা প্রচুর অর্থ ঢেলেছিল ২০০৪-এর নির্বাচনে। সেই নির্বাচনে বিজেপি সরকারের পতন হয়েছিল এবং কংগ্রেস-জোট সরকার দখল করেছিল।

সেই থেকে শুরু। বিদেশী সাহায্যের প্রতিদান, ক্ষমতাপ্রাপ্তির কৃতজ্ঞতার গোলামি। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বাজার ও অর্থনীতি ছেড়ে দেওয়ার পালা। শিল্পে বাণিজ্যে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের রাস্তা আগেই খুলে দেওয়া হয়েছিল; এবার এসেই খুলে দেওয়া হলো ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার কেনার বিদেশী রাস্তা। পরিণামে আজ বহু ভারতীয় কোম্পানী গোপনে ভারতীয় কোম্পানীর নাম নিয়ে বিদেশী হয়ে গেছে। ডাবর, রজনব্যাক্স তাদের অন্যতম। কী করে এটা সম্ভব হচ্ছে? কারণ একে একে সমস্ত দেশীয় কোম্পানী সুরক্ষা আইন বিদেশী কোম্পানীদের স্বার্থে শিথিল করে দেওয়া হচ্ছে। যেমন আগে হাজার হাজার দেশীয় কোম্পানীকে OGL আইনের অধীনে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচানো হোত। এরা ক্ষমতায় এসেই বহু দেশীয় কোম্পানীকে OGL সুরক্ষা তালিকার বাইরে বার করে দিয়েছে। এই সমস্ত দেশীয় কোম্পানী আজ বিদেশী অধিগ্রহণের Damocles 'Sword'-এর মুখে। বিদেশী কোম্পানীর স্বার্থে Merger & Acquisition আইনও শিথিল করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে চলছে ভর্তুকি বন্ধ করে দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত বড় বড় মূল শিল্প সংস্থাগুলিকে রুগ্ন করে সেগুলোর সিংহভাগ শেয়ার বিদেশীদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। একদিকে যেমন ভর্তুকি বন্ধ করে দিচ্ছে, অন্যদিকে আবার রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানীগুলোর মূলধনের উপরও থাবা বসাচ্ছে কংগ্রেস সরকার। কখনও Social Sector Spending (সামাজিক কাজে ব্যয়)-এর নাম করে, কখনও বা কোম্পানির বিল পাশ করে বাধ্যতামূলক 'Corporate Social Responsibility'-এর বোঝা চাপিয়ে। এভাবে কোম্পানীগুলোর লক্ষ কোটি টাকার মূলধন উৎপাদনে ব্যয়িত হতে না দিয়ে NREGA Direct Cast Transfer, Food Subsidy'-র মতো নির্বাচনী ঘুষ দেওয়ার আইনসঙ্গত ফন্দিফিকিরে নেমেছে কংগ্রেস দল।

সঙ্গে সঙ্গে চলছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। একদিকে অনাদায়ি ঋণের (NPA) বোঝা; অন্যদিকে বড় বড় বেসরকারী কোম্পানীগুলোর লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মুকুবের (CDR) ব্যবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে চলছে কোম্পানীগুলোকে অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য lending rate (ঋণের উপর সুদের হার) ক্রমাগত কমিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা। এর ফলে সাধারণ মানুষের আমানত (deposit)-এর উপর সুদের হারও ক্রমাগত কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য ইউরো-মার্কিন ব্যাংকগুলির মতো ভারতীয় ব্যাংকগুলিকে শুধুমাত্র ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক-এ পরিণত করা। Lehman Brother's, Maryl Lynch-এর মত মাত্র ২-৩টি ব্যাঙ্কই গড়ে তোলার ষড়যন্ত্র, যাদের কাজ হবে জনগণের টাকা নিয়ে নামমাত্র সুদে কোম্পানীগুলোকে দেওয়া। এতে জনগণের সঞ্চয় প্রবণতা কমবে; অভ্যন্তরীণ সরকারী কোষাগার শূন্যে পরিণত হবে। বিশ্ব আর্থিক সংকটেও ভারতের গায়ে আঁচ লাগেনি এই বিপুল পরিমাণ সরকারি সঞ্চয় স্কীমগুলোর কৃপায় কিন্তু ভবিষ্যতের অবস্থা হবে গ্রীসের মতো। পুরোপুরি দেশের অর্থনীতিকে তুলে দিতে হবে বিদেশী আগ্রাসীদের হাতে।

ব্যাঙ্কগুলিকে NPA আর CDR-এর বোঝায় নুব্জ করে তোলা হচ্ছে; পাশাপাশি ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে বিদেশী (FDI) অর্থে পুষ্ট Asset Recovery Cpmpany-গুলোকে। এদের কাজ হচ্ছে দেশীয় কোম্পানীগুলোর ঋণ কিনে নিয়ে বিদেশী কোম্পানীতে পরিণত করা। একদিকে দেশীয় কোম্পানীকে বিদেশীদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত, অন্য দিকে যে সমস্ত কোম্পানী ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে তা শোধ করেনি, ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করে তাদের ব্যাঙ্ক খোলার লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আবার সেই ব্যাঙ্কের ছাতার মতো বেসরকারি ব্যাঙ্ক গজিয়ে উঠবে আর রাতারাতি গণেশ উল্টে পিঠটান দেবে। কংগ্রেস সরকারের এই সমস্ত দেশবিরোধী কাজের পরিণামে আজ দেশের অর্থনীতি ভয়াবহ আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছে। অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে আজ ঘাটতি আর ঘাটতি। রাজকোষ ঘাটতি, আর্থিক ঘাটতি, রাজস্ব ঘাটতি, রপ্তানী বাণিজ্যে ঘাটতি, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি ইত্যাদি ইত্যাদি। শিল্প উৎপাদন শূন্যের ঘরে নেমেছে। এরই মধ্যে দেশের খুচরো ব্যবসাও বিদেশের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আগে বিদেশী মুদ্রা আমাদের দেশের খুচরো ব্যবসায় যথেষ্ট ব্যবহার করা যেত না। বেশ কিছু নিয়ন্ত্রণ ছিল, তাই ওই আইনের নাম ছিল FERA অর্থাৎ Foreign Exchange Regulation Act, এখন নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়ে করা হয়েছে FEMA অর্থাৎ Foreign Exchage Management Act.। গত সংসদীয় অধিবেশনে এই FEMA আইনকে আরও শিথিল করে বিদেশীদের খুচরো ব্যবসায় লগ্নীর দরজা খুলে দেওয়া হলো।

একটি কথা বলেই এই লেখা শেষ করব। ইংরেজ আমলের অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন, বিদেশীরা ভারতের মানুষের কাছে যত না প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়, তার থেকে অনেক বেশি প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল এদেশের সস্তা-গণ্ডার বাজারের। এদেশের সস্তা জিনিসপত্রের সঙ্গে দামী বিদেশী পণ্য প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে পারত না। আজকের বিদেশীরা এদেশে ব্যবসার ছাড়পত্র পেয়েই প্রথমেই ভাঙতে উদ্যোগী হয়েছে এদেশের সস্তাগণ্ডার বাজারকে। তাই তারা কংগ্রেস সরকারের সাহায্যে নানান অজুহাতে বাজারকে ঊর্ধ্বমুখী করে তুলছে। কখনও বলছে অনাবৃষ্টির জন্য দাম বাড়ছে, কখনও বলছে অতি বৃষ্টির ফলে এই দরবৃদ্ধি, কখনও বার্ড ফ্লু-র নাম করে লক্ষ লক্ষ মুরগী নিধন করে ২২ টাকা মুরগীর মাংসের দাম ৮৪ টাকায় তুলেছে। মার্কিন কেন্টাকি ক্রায়েড চিকেন (KFC)-এর দোকান এখন রমরমিয়ে চলছে। বাজারের ঊর্ধ্বমুখী মাত্রার এটাই কারণ। একদিকে জিনিসপত্রের দর বাড়িয়ে দিয়ে মানুষের আয়ের উপর থাবা বসানো হচ্ছে, অন্যদিকে ব্যাঙ্ক জমার উপর সুদ কমিয়ে মানুষের আয়ের উপর কোপ বসানো হচ্ছে। এই হলো কংগ্রেসী সরকারের জনবিরোধী, জাতি-বিরোধী, দেশ ও শিল্প বিরোধী চেহারা। শ্রম আইন সংশোধন করে নিত্য সংগঠিত শ্রমিকদের অসংগঠিত শ্রমিকে পরিণত করা হচ্ছে। কীভাবে করা হচ্ছে, সেকথা আরেকদিন। এটুকু বুঝলেই হবে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে যে কোনও আন্দোলনই জাতীয় আন্দোলন, তাকে সমর্থন করাটাই আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

একটি ভুল থেকে আরেকটি

ময়ূরী মুখার্জি

শ্রীলঙ্কার তামিল সংখ্যালঘুদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, যেটা কিছুদিন আগে পর্যন্তও ব-দ্বীপ রাষ্ট্রের কাছে কোনও জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি কিংবা ভারতের তামিলদের কাছেও উচ্চ-অগ্রাধিকারযোগ্য কোনও বিষয়ের মধ্যে গণ্য হয়নি, সেটাই আজ এইরকমই একটা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যার ফলে এখানকার কেন্দ্রীয় সরকারের পতনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তবে শেষ বিচারে তা অসম্ভব বলেই মনে হয়। গত ১৯ মার্চ ডি এম কে কেন্দ্রীয় শাসকজোটের থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়, কারণ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সর্বোচ্চ মানবাধিকার কমিটির জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে তামিল নাগরিকদের ওপর কলম্বোর অমানবিক ব্যবহারের বিপক্ষে দুর্বল প্রস্তাব আনতে চলেছে নয়াদিল্লী। এমনকী কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার থেকে যখন তাঁরা ছেড়ে বেরিয়ে যাননি, শুধুমাত্র যোগসূত্রটুকু বজায় রেখেছিলেন, তখন আমেরিকার সহযোগিতায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাবিত সংশোধন আনতে তাঁরা বাধ্য করেছিলেন।

শ্রীলঙ্কার নিন্দা করার পেছনে মনমোহন সিং সরকারের ডি এম কে-কে খুশি করার স্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল, যে ডি এম কে হলো একটি অতিশক্তিশালী আঞ্চলিক জোটসঙ্গী। যার কুফল এখনও পাচ্ছি। এটাই প্রথমবার নয় যে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে মূল প্রস্তাবের পর যে প্রস্তাবিত সংশোধনীটি আসে, তাতে তামিল জঙ্গিগোষ্ঠী এল টি টি ই-র বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করার অভিযোগে শ্রীলঙ্কা সরকারের সমালোচনা করা হয়, যেটা তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যর্থ হলো। নতুন প্রস্তাবটি যা গত ১৮ মার্চ রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে পেশ হলো তাতে শ্রীলঙ্কায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আন্তর্জাতিক মহলের উদ্বেগ নিয়ে যথেষ্ট সুর নরম করা হয়েছে। যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি শুধুমাত্র ২০০৯-এর মে মাসে শেষ হওয়া যুদ্ধের সময়েই হয়নি, তখন থেকে গত চার বছর ধরে শুধু আলোচনাই চলে আসছে। সবমিলিয়ে তিনটি প্যারাগ্রাফ এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে যেটা শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করছে এবং আগামী সেপ্টেম্বরে তামিল অধ্যুষিত শ্রীলঙ্কার উত্তরপ্রদেশে সরকারের নির্বাচন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। শেষপর্যন্ত, সংশোধিত খসড়াটি উত্তর শ্রীলঙ্কার পরিকাঠামোর পুনর্বিন্যাস নির্দেশ করছে এবং কী শিক্ষা নেওয়া হলো ও সমন্বয় কমিশনের রিপোর্ট জাতীয় সমন্বয়ের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন যে এই সংশোধনগুলি ভারতীয় কূটনীতিকদের নাগালের মধ্যেই ছিল যাঁরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে পশ্চিমী দুনিয়ার মেকি ক্রোধ থেকে শ্রীলঙ্কাকে বাঁচাতে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটাই হয় যে ভারত হয়তো বিদেশ যুদ্ধে জিতল, তবে নিশ্চিত যে ঘরে হারবেই— বিশেষ করে, খসড়ায় যদি ক্রূরতর সংশোধনীকে পুনরায় পেশ করা

যায়। এবং এটাই সব নয়, সরকার সেইসঙ্গে ডি এম কে-র দাবিও বিবেচনায় রেখেছিল, যে কারণে শ্রীলঙ্কার বিরোধিতা করে একটি প্রস্তাবও সংসদে পাশ হয়। যদি এরকম একটি প্রস্তাব সংসদে পাশ হয়েও থাকে, তবুও জাতীয় স্বার্থের সামান্য ক্ষতির সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। শুধুমাত্র এই নয় যে এতে করে নীতিগুলি লঙ্ঘিত হবে, যেগুলো বছরের পর বছর ধরে ভারতীয় বিদেশ-নীতির ভিত্তিপ্রস্তরকে সসম্মানে বহন করছে, একইসঙ্গে অন্যান্য দেশের কাছেও ভারতের বিরুদ্ধে এই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণের পথও প্রশস্ত করে দেবে। বস্তুত, পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ অনেকটা এই ঢঙেই আফজল গুরুর সংসদে হামলা কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রস্তাব নেয় এবং তার ফাঁসি কাশ্মীরের আইন- শৃঙ্খলায় কী বিপুল প্রভাব ফেলেছে, দেখিয়ে দিয়েছে ভারত কতটা আহত। এই সময়ই ভারত পাকিস্তানি হস্তক্ষেপের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং সঠিক কাজই করেছে।

কিন্তু এখন এটা বোঝা দরকার যে শ্রীলঙ্কায় তামিলদের প্রতি আচরণ— এটা কিন্তু ভারতের পক্ষে প্রভুত সতর্কতার কারণ, এর সঙ্গে জড়িত ভারতের স্বার্থের সীমারেখা অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অবধি বাড়ানো উচিত। বিষয়টা পুরোপুরি সেই দেশের সরকারের, এর সিংহলী সংখ্যাগুরু জনসমুদয়ের এবং শ্রীলঙ্কার তামিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেই বিষয়টা মোকাবিলা করতে হবে। ভারত সবচেয়ে ভাল যে কাজটা করতে পারত তা হলো হাল্কাচালে ও মিষ্টি কথায় কলম্বোকে সঠিক ভাবনায় চালিত করা। ভারত কখনওই শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে পারে না।

এর পাশাপাশি, যদি শ্রীলঙ্কার তামিলদের প্রতি ভারতের দরদ আন্তরিক হোত, তবে এটা অবশ্যই জানা যে শ্রীলঙ্কা সরকার তাদের নিজেদের কারণেই একা হয়ে পড়তো। শেষে, সুস্থির মস্তিষ্কে প্রেসিডেন্ট মাহিন্দ্রা রাজাপক্ষের সরকারের সঙ্গে কাজ করা দরকার ছিল, তাকে একঘরে করার খোঁজ না করে— যেহেতু রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই প্রস্তাব এরকম কিছু করারই খোঁজ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে ২০১২-তে শ্রীলঙ্কাকে অবনত করার বিষয়ে পশ্চিমী উদ্যোগকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করা উচিত ছিল ভারতের। বিশেষত যখন এরকমই একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে, বিশেষ করে ওইসময় একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ যখন সবেমাত্র পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছে। সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বের দরবারে বিষয়টিকে এভাবে তুলে ধরা যে, শ্রীলঙ্কা-ই হলো পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র দেশ যারা সাফল্যের সঙ্গে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে পরাজিত করতে পেরেছে। এই চমকপ্রদ সাফল্যকে চক্রান্ত করে অবহেলা করছে পশ্চিমীয় দেশগুলি। যুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষের সহযোগী মানুষদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবে তারা যুদ্ধাপরাধের বিষয়টিই জনসমক্ষে উন্মোচিত করতে একটু যেন বেশিই আগ্রহী।

২০১২-য় প্রকাশ্যে শ্রীলঙ্কার নিন্দা করার পেছনে মনমোহন সিং সরকারের ডি এম কে-কে খুশি করার স্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল, যে ডি এম কে হলো একটি অতিশক্তিশালী আঞ্চলিক জোটসঙ্গী। যার কুফল এখনও পাচ্ছি। এটাই প্রথমবার নয় যে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করল। সেপ্টেম্বর ২০১১-য়, তিস্তা জলবন্টন চুক্তির ক্ষেত্রে নয়াদিল্লী কলকাতার সামনেই চেয়েছিল, যেটা প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ঐতিহাসিক ঢাকা ভ্রমণের সময়ই স্বাক্ষরিত হতে পারতো, কিন্তু তা হয়নি। এটা শুধু প্রধানমন্ত্রীকেই হতাশ করেনি, ঢাকায় তাঁর সমকক্ষ শেখ হাসিনাকেও সমানভাবে হতাশাগ্রস্ত করেছিল।

বাংলাদেশি প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সরকারকে তাঁর সাধ্যাতীত সহায়তা করেছিলেন যখন তিনি তাঁর দেশে জঙ্গিদের প্রত্যাখ্যান করে নয়াদিল্লীর হাতে তাদের তুলে দিলেন। কিন্তু এর প্রতিদানে তিনি কিছুই পেলেন না। এর মধ্যে তিনি আবার কড়া পুনর্নির্বাচনী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করলেন এবং যেখানে তিনি নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করবার জন্য তিস্তা চুক্তিকে ব্যবহার করতেই পারতেন। সব মিলিয়ে, এটা ভারতেরই স্বার্থ ছিল যে হাসিনার ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং কট্টর ভারত-পন্থী সরকারকে (যার মূল বিরোধীদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন দল, যাঁর জোটসঙ্গী ইসলামিক মৌলবাদীরা এবং যারা কখনওই নয়াদিল্লীর প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না) সমর্থন করা।

দুর্ভাগ্যবশত, এই উপমহাদেশে ভারতের বিদেশ-নীতি দুর্বোধ্য এক সংকীর্ণ দৃষ্টির বলি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রকৃতপক্ষে যদিও বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতের সঙ্গে তার অধিকাংশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রেরই কোনও না কোনও বন্ধন ছিল, নয়াদিল্লী তার ঘনিষ্ঠ চার পাশের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করছে, যার ফলে এখানে জটিল বিদেশ নীতির উদ্ভব হয়েছে।

(সৌজন্যে : দি পাইওনীয়ার)

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর ''চিঠিপত্র'' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা (পিন কোড সহ) এবং ফোন নম্বর থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না

— সঃ স্বঃ

কলম্বো শাস্তি পেল, কিন্তু এখন কি হবে?

কাঞ্চন গুপ্ত

তামিলনাড়ুতে শ্রীলঙ্কা বিরোধী আন্দোলন ও খবরের কাগজগুলোতে শ্রীলঙ্কা বিরোধী প্রচার যখন হারিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপুঞ্জের হিউম্যান রাইট কাউন্সিল জেনেভায় ভোটাভুটির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুমোদিত এবং ইউরোপ কর্তৃক সমন্বিত প্রস্তাব যা শ্রীলঙ্কার মানবতাবিরোধী কার্যকলাপকে নিন্দা করে রচিত। এটাও অবাক করার ঘটনা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তামিল টাইগারকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে মনে করে। ইউরোপও তাই। তবুও তারা বলছে, 'স্বাধীন ও গ্রহণযোগ্য তদন্ত হোক, বিষয়টিকে এখন যুদ্ধাপরাধ হিসেবে জাতিসঙ্ঘের ৪৭ সদস্যযুক্ত সংস্থা ভাবছে। গত বৎসর এইরকম একটি ভোটাভুটিতে ২৫ সদস্য দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ও ১৩টি দেশ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু ৮টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। ২০১২ সালে ভারত প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়ে শ্রীলঙ্কার বিরোধিতা করে।

একথা ভাবার কোনও কারণ নেই যারা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে তারা শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে ব্যথিত হয়ে ভোট দিয়েছে। অথবা কোনও নীতিগত বাধ্যবাধকতায় এবং উচ্চতর আদর্শের কারণে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে তাও নয়। কোনও স্বাধীন দেশের বিপক্ষে কোনও প্রস্তাব কার্যকর করার ক্ষমতা জাতিসঙ্ঘের এই ফোরামের নেই।

যে দেশটি নিজেই ড্রোন আক্রমণের মাধ্যমে বহু মানুষকে হত্যা করেছে, যাতে শিশু ও স্ত্রীলোক রয়েছে, যে দেশটি পৃথিবীতে এত রক্ত ঝরিয়েছে যার হিসেব নেই, সেই দেশটিই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে মানবাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনছে। ভারতের পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে সে এই প্রস্তাবের পক্ষে। কেননা ভারত গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে এটাই সঠিক পথ।

এই অবাস্তবতাকে আরও অবান্তর করে তুলেছে বাস্তব কারণ। তাই ভারতকে নিজের সঙ্গে প্রতারণা করতে হয়েছে। কংগ্রেস ইউপিএ সরকারকে বাধ্য করেছে এই সিদ্ধান্ত নিতে। কংগ্রেস তার বিগড়ে যাওয়া প্রার্থীর চাপে আছে। DMK তার বিগড়ে যাওয়া বন্ধু। কংগ্রেস মনে করেছে সরকারকে বাধ্য করে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ভোট দিতে ও পার্লামেন্টে এক প্রস্তাব নিয়ে ডি এম কে-কে নিজেদের সঙ্গে রাখা যাবে। কংগ্রেসের অপরিণামদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে বিজেপি ও বামপন্থীরা। কংগ্রেস যদি বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে অবিবেচকের মতো একটি স্বাধীন দেশের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে পারতো তা আমাদের কলঙ্ক হয়ে থাকতো। করুণানিধি যে কারণে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভোট দেবার কথা বলেছেন সে কারণের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার তামিলদের দুর্দশার কোনও সম্পর্ক নেই।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব এনে

আমেরিকা বা ভারতের কোনও লাভ হবে না। অন্যরা যারা ভোট দিয়েছে তার জানে বিধিনিষেধযুক্ত প্রস্তাব পাশ করানোর অর্থ ঢিলের বদলে পাটকেল মিলবে বা হাসাহাসির কারণ হবে।

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মহিন্দা রাজাপক্ষে তো বলেই দিয়েছেন এই প্রস্তাব অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রস্তাব পাশের পর একথা বলা ঠিক হবে না যে শ্রীলঙ্কা UNHRC দেওয়া সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে নেবে। স্বাধীন গ্রহণযোগ্য তদন্ত করতে সাহায্য করবে। শ্রীলঙ্কাই একমাত্র দেশ নয় যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছে।

ইজরায়েল এসব নখদন্তহীন সংস্থার সিদ্ধান্তের পরোয়া করে না। যে সমস্ত দেশকে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়তে হয় সে সমস্ত দেশ তার ভাগ্যকে অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দিতে পারে না। কিছু দেশ, বিশেষ করে ইউরোপ এবং আমেরিকা নিজের মর্জিমাফিক অন্য দেশকে সভ্য করার দায়িত্ব নিয়েছে। তারা স্বঘোষিত দায়িত্বে ভালো আর মন্দের বিচার করছে।

শ্রীলঙ্কাকে শাস্তি দিয়ে আমেরিকা সরাসরি কোনও ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। কিন্তু ভারতের হবে। শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন-কে তেল ভাণ্ডার ভাড়া দিয়েছে যা এখন ফেরত চাইছে শ্রীলঙ্কার ত্রিঙ্কোমালিতে কৌশলগত কারণ হিসেবে তেল ভাণ্ডার তৈরি ও সংরক্ষণ করা হবে। আগামী দিনে শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় ব্যবসা ও পরিষেবার উপর প্রভাব পড়বে। অন্যদিকে দেখা যাবে শ্রীলঙ্কা চীন ও বেজিং-এর সঙ্গে নৈকট্য বাড়াচ্ছে।

আমরা এখন কি করবো? ঘটনাক্রমের সঙ্গে চলবো? প্রস্তাবের পক্ষে আবার ভোট দেব? কংগ্রেস ও ইউপিএ সরকারের মনে হয়েছে নরমে-গরমে শ্রীলঙ্কার চিন্তাভাবনাকে বদলানো যাবে। ভারত ব্রাউন সাহেবের পথে চলতে চাইছে। একথা ভাবতে কষ্ট হচ্ছে ভারত আবার রাজীব গান্ধী এবং তার মা ইন্দিরা গান্ধীর পথে এগোতে যাচ্ছে।

আমি আবার শুরু থেকে আরম্ভ করতে যাচ্ছি। হঠাৎ করেই তামিলনাড়ুতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গর্জে উঠায় মনে হয়েছে শ্রীলঙ্কার মেজরিটি বৌদ্ধ জনসমাজ, সরকার ও প্রেসিডেন্ট মরে গেছে। তামিলনাড়ুর তামিল শুভাকাঙ্ক্ষীরা দেখবে প্রস্তাবটি নিজের গতিতে তার শেষ পরিণতি লাভ করেছে। এই ভাবে কি শ্রীলঙ্কায় তামিলদের প্রতি বৈমাতৃসুলভ ব্যবহার ও স্নেহহীন ব্যবহারের সুরাহা করা যাবে। কলম্বোকে হিংসার পথ ত্যাগ করে সঠিক রাস্তায় নিয়ে আসার জন্য আমরা কি করেছি?

শ্রীলঙ্কার বিশ্বাস ও আস্থা ফিরিয়ে আনতে সরকারকে অনেক কিছু করতে হবে। ১৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে কলম্বোকে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিককে ন্যায় ও দায়িত্ববোধের আওতায় আনতে হবে। এই ব্যবস্থাগুলো আহামরি ব্যাপার নয়। এইগুলো আগেই হতে পারতো, কিন্তু হয়নি। অতীতকে পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে যেতে পারতাম এবং শ্রীলঙ্কার জন্য নতুন ভবিষ্যৎ গড়তে পারতাম এবং ও পক্ প্রণালীর তীরের তামিলরাও এর অংশীদার হতে পারতো। কলম্বো ও দিল্লী উভয়ই ব্যর্থ হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনায় প্রমাণ হয়, জাতি হিসেবে আমরা শ্রীলঙ্কাকে দিয়ে কিছু করাতে পারিনি। কলম্বোকে সঠিক কাজ করানোর ক্ষমতা আমরা দেখাতে পারিনি। জেনেভা বৈঠকের পর এই দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে।

(সৌজন্যে : পাইওনীয়ার)

'স্বস্তিকা' নববর্ষ সংখ্যার

(১৪২০ বঙ্গাব্দ)

প্রকাশ অনুষ্ঠান

১৩ এপ্রিল, ২০১৩, শনিবার,
বিকাল ৫.৩০ মিনিট
স্থান — কেশব ভবন
৯এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা -৬

সকলকে সাদর আমন্ত্রণ

আপনার স্বপ্নগুলো যা-ই হোক ধাপে ধাপে তাকে বাস্তবায়িত করুন

MUTUAL FUND-এ SIP শুরু করুন।

প্রতি মাসে মাত্র 500 টাকা করেও শুরু করা যায়।

DRS INVESTMENT

Debashis & Subhasis Dirghangi
Mutual Fund/Insurance/ Fixed Deposit/ Pan Service/Mediclaim

facebook|http://facebook.com/ debashislicmdrt

Mobile No. 9830372090/9433359382/81

মায়নমারে বৌদ্ধ নীতি : দাঁতের বদলে দাঁত

বর্তমান মায়নমার (পূর্বের ব্রহ্মদেশ) এক সময় বৃহত্তর ভারতের অঙ্গ ছিল। শান্তির খোঁজে সেখানকার মানুষ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে। তারা শান্তিতে থাকতে চাইলেও শান্তিতে থাকতে দেবে না অশান্তির বাহকেরা। মায়ানমারের মেইকটিলা শহরে বৌদ্ধ ও মুসলিমদের বাস। সম্প্রতি এক

দাঙ্গা প্রতিহত করতে রাস্তায় নেমেছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও।

মুসলিম দোকানদারের সঙ্গে বৌদ্ধ ভদ্রলোকের বচসা বাঁধে, সেই সুবাদে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রাণ নেয় মুসলিমরা, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে সন্ন্যাসীর নেতৃত্বাধীন বৌদ্ধ সমাজ। ২০ জন নিহত ও ৬ হাজার মুসলিম ঘরছাড়া হয়। প্রথম এই ঘটনা ঘটে ২২ মার্চ শুক্রবার। তারপর এই দাঙ্গা ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় তিনটি শহরে চলছে দাঙ্গা। ২৬ মার্চের খবরে জানা যায় নিহত মুসলিমের সংখ্যা ৩২ জন ও ঘরবাড়ি ছাড়া হয়েছেন ১০ হাজার। মায়নমারের রাজধানী শহর ইয়াঙ্গন। সেখানেও এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। টাটকোন, ইয়াঙ্গনেরও অনেক মসজিদ ধূলিসাৎ করে বৌদ্ধরা। এক চিত্রসাংবাদিক যখন ফটো তুলছিলেন তখন তার গলায় ১ ফুট লম্বা ছোরা চেপে ধরেন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। পরিচয়পত্র দেখিয়ে রেহাই পান সেই চিত্রসাংবাদিক। জরুরী অবস্থা জারী করে সরকার। মার্শাল'ল জারী করে সেনা নামায় মায়ানমার সরকার।

ইয়াঙ্গন শহর থেকে ৫৪০ কিলোমিটার দূরে বিভিন্ন পথ জুড়ে মৃতদেহ পড়ে আছে। শহরের পাঁচটি মসজিদ পুড়ে ছাই। কিছুদিন আগে রোহিঙ্গা মুসলিমদের কয়েক শত লোক মারা যায় বৌদ্ধদের হাতে। সে ঘটনায় ১ লক্ষ মুসলিম জনতা বাড়িঘর ছাড়া হয়েছিল। এ ঘটনার সঙ্গে এবারের ফারাক হলো বৌদ্ধ সমাজের সঙ্গে অ-হিংসার বাহক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও দাঙ্গায় অংশ নেয়। তারা কোনও কোনও হিন্দু সন্ন্যাসীর মতো রাম-রহিমের গল্প শোনাননি। ভারতের কিছু পত্র-পত্রিকা কান্না জুড়ে দিয়েছে। চোখের জলে তারা না জানি আরেকটি গঙ্গা বানিয়ে ফেলেন! যখন মুসলিমদের ঘর পুড়ছিল তখন বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর নেতৃত্বাধীন জনতা আগুন নেভাতে দেয়নি। মেইকটিলা শহরে বৌদ্ধ বিহারগুলো বৌদ্ধ ও সাংবাদিকদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠে। মায়নমারে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক সংস্কারও ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। মায়নমারের জনতা যখন গণতন্ত্রের দিকে হাঁটছে তখনই গণতন্ত্রের পরিপন্থী মুসলিম জনতা আসুরিক শক্তির প্রয়োগ করতে পথে নেমেছিল।

LAW পড়তে চান?

DHEYAN

YOUR SUCEESS OUR MISSION

বারাসাত, কলেজস্ট্রিট, ঢাকুরিয়া, হাওড়া

9831097463 / 9474759899

SATYA NARAYAN ACADEMY

C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY
RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH
SCIENCE & COMMERCE STREAM
BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.

CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR
BANKURA - 722155

CONTACT - 9433175048 / 9732063765

ADVT.

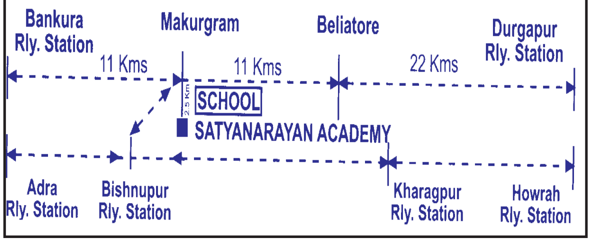

চিঠিপত্র

ক্যানিং-এর পুনরাবৃত্তি

সম্প্রতি ক্যানিং-এর হিন্দুনিধন ঘটনা হতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে সরকারি তোষণপুষ্ট মৌলবাদী মুসলিমরা অচিরেই আবার পশ্চিমবাংলার বুকে যে কোনও স্থানে ক্যানিং-এর পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে, তাতে কোনও সন্দেহ নাই। যেভাবে তারা একজন বিত্তশালী বয়স্ক মৌলবাদী মুসলিমের বাংলাদেশী দুষ্কৃতীর হাতে মৃত্যুকে হিন্দুরা হত্যা করেছে বলে নির্বিচারে প্রচার করেছিল পশ্চিমবাংলার প্রশাসনও তাকে মেনে নিয়েছিল। যেভাবে ২৮৮টি হিন্দুবাড়ি আগুনে ভস্মীভূত করা হলো তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে আগামী দিনে হিন্দুদের ভাগ্যে অনুরূপ আরও নির্যাতন অপেক্ষা করছে। অতএব, এখনই সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। হিন্দুরা চিরকালই ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু ও ধর্মপরায়ণ জাতি। সহজে ধৈর্যচ্যুত হয়ে কারও উপর অত্যাচার করে না— একথা ইতিহাসে প্রমাণিত। তাই তারা দীর্ঘ আটশত বৎসর মুসলিম শাসনকালেও চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আজও স্বমহিমায় টিকে আছে।

কিন্তু বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেভাবে হিন্দুদের দিন দিন প্রতিকূল অবস্থার মুখে দাঁড় করাচ্ছে তাতে অন্তত নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদে আত্মনির্ভরশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তবে সেটা অপরকে আক্রমণ করার জন্যে নয়, নিজেদের রক্ষা করার তাগিদে। কারণ ইতিহাস প্রমাণ, হিন্দুরা এক আত্মবিস্মৃত শান্তিপ্রিয় জাতি। অতীতেও তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেনি, আর আজও তারা দ্বিধা বিভক্ত। অতীতের কথা ভুলে এখনই সংগঠিত হতে হবে, নচেৎ সংখ্যাগুরু হয়েও নিজভূমে পরবাসী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ইতিমধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে আর সেই সুযোগে মুসলিমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের আখের ঘুছিয়ে নিচ্ছে। না হলে ক্যানিং-এর মত এতবড়ো ঘটনা কি কোনও সংবাদ মাধ্যম, কি সরকার কোনও গুরুত্বই দিল না। উল্টে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একে সামান্য ঘটনা বলে চালিয়ে দিলেন। আর যাদের ভাগ্য পুড়ল, যারা গৃহহীন হয়ে আজ খোলা আকাশের নিচে অতিকষ্টে জীবন যাপন করছে, তাদের প্রতি সরকার এতোটুকু সহানুভূতি কিংবা কোনও সাহায্য বরাদ্দ করল না। এইসব হিন্দুরা এতোই হতভাগ্য যে, তাদের ভাগ্যে শুধুই জুটল বিড়ম্বনা। যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা হোত তাহলে দেদার সাহায্য ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তখনই নিরুপিত হোত।

এ থেকেই ভেবে দেখুন, পশ্চিমবাংলার হিন্দুরা আজ কোন অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

তাই এখনও সময় আছে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার, হেলায় সময় নষ্ট না করাই ভাল।

— পাঁচুগোপাল ঘোষ, নরেন্দ্রপুর, হাওড়া।

‘যাহা নাই ভারতে...’

মনোজ মিত্র রচিত এবং সুন্দরম্ নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত ‘যাহা নেই ভারতে’ নাটকটির ভূয়সী প্রশংসা করে দেবাদিত্য চক্রবর্তী বলেছেন— নাটকটি যেন অনেক কথা বলে দিয়ে গেল। (স্বস্তিকা, ১১.৩.১৩)। দেবাদিত্যবাবু নাটকের সেই অন্তর্নিহিত ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেননি। তাই বুঝা গেল না, নাট্যকার নাটকটির মাধ্যমে কি বিশেষ বার্তা দিতে চেয়েছেন। যা বুঝা গেল তা হলো, মহাভারতের মূল কাহিনীর সঙ্গে কষ্টকল্পিত কিছু চরিত্র, ঘটনা এবং চটকদার সংলাপের সমাহারে নাটকটি রচিত হয়েছে।

মহাভারতের কাহিনীভিত্তিক এই নাটকে প্রক্ষিপ্ত কাহিনীগুলির অন্যতম— ভীষ্মের আক্ষেপ। ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্য অম্বিকা ভীষ্মকে চেয়েছিল। অম্বিকাকে মনে মনে কামনা করলেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভীষ্ম তাতে রাজি হননি। সেদিনের কথা স্মরণ করে ভীষ্ম সখেদে বলছেন—‘প্রতিজ্ঞা করে তিনি হয়তো ভুলই করেছেন’।

মহাভারতে ওরকম কোনও ঘটনার বিন্দুবিসর্গ নেই। সেখানে আমরা দেখতে পাই, ‘বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে পুত্রবধূ, কনিষ্ঠা ভগিনী বা দুহিতার ন্যায় যত্নসহকারে হস্তিনাপুরে নিয়ে এসেছিলেন।’— ‘মহাভারত’ (সারানুবাদ) ; রাজশেখর বসু।

উপসংহারে নাট্যসমালোচক বলেছেন— মহাভারতের নতুন রকম বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ এই নাটকটি একটি মনোজ্ঞ প্রযোজনা। কিন্তু, আজগুবী সংলাপ ও মহাভারতের কাহিনী বিকৃত করে রচিত একটি নাটক যতই মনোজ্ঞ হোক না কেন, তা কি আদৌ প্রশংসা বা সমর্থনের যোগ্য?

—বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

পশ্চিমবঙ্গ না মুসলিমবঙ্গ ?

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংখ্যালঘুপ্রীতি সর্বজনবিদিত। তিনি সিঙ্গুরের ধর্নামঞ্চে মুসলিম মহিলাদের অনুকরণে পোষাকাবৃতা হয়ে নামাজ আদায় করলেন। আমরা ছবিতে দেখেছি তিনি পারিষদবর্গের মাথায় টুপি পরিয়ে সপারিষদ ইফ্‌তার পার্টিতে যোগ দিলেন, নামাজের ভঙ্গিমা করলেন, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় সভামঞ্চে মুসলিম মহিলাদের মতো কপাল ঢেকে কান খুলে রেখে বক্তৃতা দিলেন। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুরা অনুন্নত, অনগ্রসর, অবহেলিত, অনাদৃত, শিক্ষার আলোকবর্জিত, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এবং আরও অনেক কিছু। তাই তিনি সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য জান কবুল করেছেন। কিন্তু সংখ্যালঘুদের অশিক্ষা, দারিদ্র্যের মূল কারণ নির্ধারণ করে এবং সেটা দূর করার ব্যবস্থা না করে শুধু কোটি কোটি টাকা ব্যয় করলেই কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ঘটবে? অবশ্যই না। কিন্তু সেটাই করে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষের সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ২০ মে ২০১২, বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য ঘোষিত প্রকল্পগুলির কয়েকটি আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) পশ্চিমবঙ্গে উর্দুভাষাকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষার মর্যাদা দান। যে উর্দুভাষাকে বাংলাদেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হয়েছে, তাকে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে মহিমান্বিত করা হলো। কিন্তু এতে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিপুত্র বাংলাভাষী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কি উন্নতি হবে? কিছুমাত্র না।

(২) পশ্চিমবঙ্গে ১০ হাজার স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসাকে স্বীকৃতিদানের ঘোষণা। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কি উন্নয়ন ঘটবে? কিছুমাত্র না। বরং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যারা মাদ্রাসা শিক্ষা পরিহার করে বর্তমান যুগের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন তারাই পরবর্তীকালে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক, ব্যবস্থাপক, এ্যাডভোকেট, আই এ এস, আই পি এস, প্রভৃতি হয়েছেন। আর মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা বড়জোর মাওলানা, মওলভী প্রভৃতি হয়েছেন।

(৩) সংখ্যালঘুদের জন্য ব্যয়বরাদ্দ ৩৩০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫৭০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

(৪) ১৬.৫ লক্ষ সংখ্যালঘু ছাত্র ছাত্রীকে ৫৭০ কোটি টাকা স্টাইপেন্ড, স্কলারশিপ বাবদ দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রতি বছর মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় বহু অভাবী কিন্তু মেধাবী হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় ভাল ফল করলেও দারিদ্র্যের কারণে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে অপারগ। ওই সমস্ত অভাবী এবং মেধাবী হিন্দু ছাত্রছাত্রী ভাবতেই পারে তারা যদি ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম কবুল করে তাহলে তারাও সরকার থেকে স্টাইপেন্ড, স্কলারশিপ প্রভৃতি পাবে, তাহলে তারা নিজেরাই তাদের উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহন করতে পারবে। এক্ষেত্রে বলা কি অসঙ্গত হবে সরকার ওইসব মেধাবী কিন্তু অভাবী হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের প্রলোভিত করছে, প্রভাবিত করছে, উৎসাহিত করছে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য, ইসলাম কবুল করার জন্য?

(৫) সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় গীতাঞ্জলি ও বেগম রোকেয়া আবাসন প্রকল্প শুধুমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য। অর্থাৎ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মহিলাদের আবাসনের কোনও প্রয়োজন নেই। 'নিজ গৃহ, নিজ ভূমি' প্রকল্পেও গৃহহীন ইমামদের বাড়ি তৈরির জন্য তিন কাঠা করে জমি এবং অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে।

(৬) ইমাম সাহেবদের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ৩০ হাজারের মতো। এদের প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর মুয়াজ্জীনদের জন্য মাসিক ভাতা ১০০০ টাকা। এদের কাজ নাকি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বছর দুই আগে হাওড়ার এক দরিদ্র পুরোহিত দারিদ্র্যের কারণে তিন অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ দিতে পারেননি। তাই সপরিবারে আত্মহত্যা করেছিলেন। সরকারের তাতে কোনও হেলদোল নেই।

(৭) মুসলমান ছাত্রীদের সরকার থেকে বিনামূল্যে বাই-সাইকেল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে। কিন্তু দরিদ্র হিন্দু ছাত্রীরা কি দোষ করল? জবাব পাওয়া যাবে না।

(৮) রাজারহাটে ২০ একর জমি দেওয়া হয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত ক্যাম্পাস স্থাপন করার জন্য। মুসলিম দেশগুলি থেকে ছাত্ররা আসবে।

(৯) রাজারহাট নিউটাউনে ৫ একর জমি বরাদ্দ হয়েছে রাজ্যের তৃতীয় হজনিবাস তৈরীর জন্য। এই সমস্ত হজনিবাসে হজযাত্রীরা থাকেন সরকারি ব্যয়ে ও ব্যবস্থাপনায়। হজযাত্রা ব্যয়বহুল। একজন হজযাত্রীকে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করতে হয় হজযাত্রার জন্য।

অর্থাৎ শুধুমাত্র ধনী, বিত্তশালী বা উচ্চবিত্ত মুসলমানদের পক্ষেই সম্ভব হজযাত্রায় অংশগ্রহণ করা। আর এদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে। আর হিন্দু তীর্থযাত্রীদের তারকেশ্বর, গঙ্গাসাগর, সবরীমালাই, মানস সরোবর, কৈলাশ প্রভৃতি তীর্থস্থানে তীর্থ করতে যেতে কর দিতে হয়। অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে।

সবকিছু পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গকে মুসলিমবঙ্গে পরিণত করা সময়ের অপেক্ষামাত্র। রাজনৈতিক নেতাদের প্রচ্ছন্ন মদতে, সরকারের উদাসীনতা এবং পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় মুসলিম যুবসমাজের একাংশ ক্রমাগত উদ্ধত, বেপরোয়া এবং দুঃসাহসী হয়ে উঠছে। এরা এতই উদ্ধত এবং বেপরোয়া যে বাসে উঠে বাস ভাড়া দিতে অস্বীকার করে (স্থান, কাল পাত্র ভেদে), হুমকি দেয় "চলো হামরা মহল্লামে। তুমকো দেখ লেঙ্গে," ব্যাঙ্কে ঢুকে কোনও কারণে কাজ না হলে বলে ওঠে "কিঁউ নেই হোগা? তেরা বাপকা ব্যাঙ্ক হ্যায়?" ফাঁকা রাস্তায় তরুণীকে একা পেলে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে। তারপর তার অচৈতন্য দেহটা রাস্তায় ফেলে রেখে যায়। সবকিছু দেখে শুনে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গকে মুসলিমবঙ্গে পরিণত করা সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

ঐতিহাসিক দুর্গ কুম্ভলগড়

সোমশুভ্র চক্রবর্তী

বীরভূমি রাজস্থানের মুকুটমণি মেবার প্রদেশ। মেবারের অন্তর্গত রাজসামন্দ জেলার নামদ্বার থেকে উত্তরে, দুর্গম আরাবল্লী পর্বতমালার ৩৫৬৪ ফিট উচ্চতায় ঘন অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত সুবৃহৎ কুম্ভলগড় দুর্গ। কুম্ভলগড় ৩৬ কিমি বিস্তীর্ণ শক্তিশালী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, যা বিশ্বে চীনের প্রাচীরের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম।

সাতটি বৃহৎ লৌহদৃঢ় কপাট, যথা আরেটপোল, হনুমানপোল, বিজয়পোল প্রভৃতি। ছিদ্রযুক্ত শক্তিশালী প্রাচীর, মজবুত বুরুজ এবং প্রহরার্থে উচ্চকক্ষ প্রভৃতি সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ফলে কুম্ভলগড় বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বদা ছিল অপরাজিত। দুর্গচত্বরে অবস্থিত আনুমানিক ৩৬০টি মন্দির রাণাকুম্ভের সুসংস্কৃত শিল্পবোধের পরিচায়ক। দুর্গের মূল আকর্ষণ, তার সর্বোচ্চভাগে অবস্থিত অতি মনোরম 'বাদল মহল', যেখানে ১৫৪০ সালে বীর শিরোমণি মহারাণা প্রতাপের জন্ম হয়। মহলের শিল্পকলা মনোমুগ্ধকর। দুর্গের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থানগুলি হলো— রাণাকুম্ভ নির্মিত যজ্ঞাদির বৃহৎ ভবন 'বেদী' ও কুম্ভস্বামী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, দীর্ঘকায় শিবলিঙ্গযুক্ত নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির, হনুমানপোলে বজরঙ্গবলীর সুবিশাল মূর্তি (এই মূর্তি রাণাকুম্ভ ১৪৫৭ সালে নাগোর বিজয়ের পর কুম্ভলগড়ে প্রতিষ্ঠা করেন), ঝালি বাউড়ী এবং মামাদেবের কুণ্ড। এছাড়াও কয়েকটি অপরূপ শিল্পকলা সমৃদ্ধ জৈনমন্দির এবং কুম্ভস্বামী মন্দিরের বহির্ভাগে শিলাখণ্ডে খোদিত রাণাকুম্ভের বিজয়গাথা বর্ণিত পাঁচটি 'প্রস্তুতি' ইত্যাদি দুর্গের অন্যতম দ্রষ্টব্যস্থল। ১৪৫৮ খৃস্টাব্দে যুদ্ধশাস্ত্র ও শিল্পশাস্ত্র বিশারদ মেবারকুলতিলক মহারাণা কুম্ভ দ্বারা কুম্ভলগড় দুর্গের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়। তিনি কুম্ভলগড়কে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র করে মেবার সাম্রাজ্যের বিস্তার করেন এবং পশ্চিম ভারতে এক শক্তিশালী হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

১৪৪২ খৃস্টাব্দে মালবের বাদশা মহমুদ খলজী রাণাকুম্ভের হস্তে নিজ পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে কুম্ভলগড় আক্রমণ করে। সেই সময়ে যুদ্ধসূত্রে মহারাণার অন্যত্র অবস্থান সত্ত্বেও কুম্ভলগড়ের পরাক্রমী ক্ষুদ্র রাজপুত সৈন্যদল প্রবল বিক্রমে এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। সেনাপতি দীপসিংহের নেতৃত্বে রাজপুতগণের বীরত্বে বাদশাহী ফৌজ পশ্চাদ্‌পসরণে বাধ্য হয়। ১৪৪৬ সালে সুলতান মহমুদ পুনরায় কুম্ভলগড় আক্রমণ করে কিন্তু রাণাকুম্ভের নেতৃত্বে রাজপুত সৈন্যগণের প্রবল পরাক্রমে মুসলমান বাহিনী চরম পর্যুদস্ত হয়। ১৪৫৬ সালে গুজরাট ও মালবের সুলতান, কুতুবুদ্দিন এবং মহমুদ একত্রে তাদের বিশাল সৈন্যদল সহ মেবারের ওপর আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে কুম্ভলগড়কে রণকৌশলগত কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করে রাণাকুম্ভ উভয় বাহিনীকেই পরাজিত করেন। বেশ কিছু মাস যাবৎ গুজরাটের সুলতান কুতুবুদ্দিন কুম্ভলগড় অবরোধ করলেও রাজপুতদের দুর্গ থেকে অকস্মাৎ প্রবল আক্রমণ ও দক্ষতাপূর্ণ গেরিলাযুদ্ধের ফলে সুলতানের বাহিনী পশ্চাদ্‌পসরণে বাধ্য হয়। ১৪৫৭ সালে সুলতান কুতুবুদ্দিনের পুনরায় কুম্ভলগড় দুর্গ আক্রমণ অসফল হয়।

মহারাণা রায়মল্লের পুত্র বীরচূড়ামণি পৃথ্বীরাজ আজীবন কুম্ভলগড়েই ব্যতীত করেন এবং চারিপাশের বিস্তৃত ভূখণ্ড স্বীয় বাহুবলে নিজ অধিকারে আনেন। মেবার-গৌরব রাণা সংগ্রামসিংহের কৈশোর কুম্ভলগড়েই ব্যতীত হয় এবং এখান থেকেই তিনি সৈন্যসংগ্রহ করে চিতোরে নিজ অধিকার স্থাপন করেন। ধাত্রীপান্নার অসামান্য ত্যাগের ফলস্বরূপ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু এড়িয়ে, বালক উদয়সিংহ কুম্ভলগড়ের দুর্গরক্ষক আশা দেবপুরার আশ্রয় লাভ করেন। ১৫৩৭ সালে কুম্ভলগড়েই মেবারের সামন্তগণ দ্বারা তাঁর রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন হয়। উদয়সিংহ কুম্ভলগড় থেকেই সৈন্যসংগ্রহ করে অত্যাচারী বনবীরকে বহিষ্কৃত করে চিতোরকে পুনরায় শিশোদিয়া বংশের শাসনাধীন করেন।

'হিন্দুসূর্য' মহারাণা প্রতাপ কুম্ভলগড়কে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র করে মেবারের শাসন তথা মুগলদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। মুগল বাদশা আকবরের কুম্ভলগড় দখলের বহু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে মার্চ ১৫৭৮ সালে, শাহবাজ খানের নেতৃত্বে বিশালবাহিনী দুর্গটি অবরোধ করে। তারা গোড়বাড় ও কেলবাড়ের দিকে যাওয়ার সমস্ত পথগুলি বন্ধ করে দেয়, ফলে কুম্ভলগড়ে রসদ পৌঁছানো বন্ধ হয়ে যায়। রাণাপ্রতাপ কিছু সাহসী যোদ্ধাকে দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করে বাকি সৈন্যদলের সঙ্গে রণকপুরের দিকে প্রস্থান করেন। মুগল-রাজপুত বাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়। প্রবল বীরত্বের সঙ্গে ক্ষুদ্র রাজপুতবাহিনী মুগল আক্রমণ প্রতিহত করে। কিন্তু অকস্মাৎ দুর্গে একটি বড় তোপে বিস্ফোরণ হওয়ায় সমস্ত যুদ্ধের সরঞ্জাম ভস্মীভূত হয়ে যায়, সুনিশ্চিত মৃত্যু জেনে অবশিষ্ট রাজপুত বীরগণ দুর্গের কপাট খুলে শত্রুসমুদ্রে তীব্র গতিতে আঘাত হানেন। রাওভান, শোনীগোরা প্রমুখ বীর সর্দারগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবিক্রমে শত্রুসৈন্য সংহারপূর্বক বীরগতি লাভ করেন। দুমাসের অবরোধের পর শতাব্দী যাবৎ অপরাজিত কুম্ভলগড় দুর্গ ৫ জুন ১৫৭৮ খৃস্টাব্দে, ইতিহাসে প্রথম ও অন্তিমবার শত্রুবাহিনী দ্বারা অধিকৃত হয়।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই মহারাণা প্রতাপ পুনরায় কুম্ভলগড় উদ্ধার করেন। প্রতাপ ও তাঁর বীর সৈন্যদের ভয়ে দুর্গের মুগলবাহিনী বিনাযুদ্ধে পলায়ন করে এবং পুনরায় হিন্দু গৌরবরবি উদিত হয় কুম্ভলগড়ে। এরপর কখনওই এই দুর্গ বহিঃশত্রু দ্বারা অধিকৃত হয়নি।

আরাবল্লীর বুকে মেবারের রাজপুতদের যশোকীর্তির সাক্ষীস্বরূপ হয়ে অপরাজেয় কুম্ভলগড় উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান।

নর্মদার সাধু

নবকুমার ভট্টাচার্য

মনের নিকট সাধু হইতে পারিলে সত্যই সে সাধু, মনই জানে সে সাধু না চোর। স্বামী অদ্ভুতানন্দ এজন্যই বলেছেন, যে মনে অসাধু বাইরে সাধুর ভেক পরেছে— সে চোর। শাস্ত্রেও তাই রয়েছে— 'শিরো মুণ্ডিতং তুণ্ডং মুণ্ডিতং চিত্তং ন মুণ্ডিতং কিমর্থং মুণ্ডিতং। যস্য পুনশ্চ চিত্তং মুণ্ডিতং সাধু সুষ্ঠু শিরস্তস্য মুণ্ডিতম্।' অর্থাৎ সাধু। তুমি

মাথা কামিয়েছ, মুখ কামিয়েছ, কিন্তু মন তো কামাওনি। তাহলে আদৌ কামালে কেন? দেখো, যার মন ঠিক মতো কামানো, তার মাথা আর মুখও ঠিকমতো কামানো। অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধিই বড় কথা। চিত্তশুদ্ধি না হলে কেবল রাঙানো কাপড় পরে সাধুর বেশ ধারণ করলে কোনও লাভ নেই। স্বামী অদ্ভুতানন্দ তাইতো বলেছেন— 'যার ভিতর বাহির গেরুয়া রঙ্গে রঙ্গেছে— সে ঠিক ঠিক ত্যাগী, সন্ন্যাসী।' সন্ন্যাসীর জীবন যেন নির্জলা একাদশী। একটুও মালিন্য থাকবে না— নিষ্কলঙ্ক জীবন হওয়া চাই। আজকের দিনে এরকম পবিত্র নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধ আত্মার সন্ধান মিলবে কোথায়? ভারতবর্ষ সাধুসন্তের দেশ। এদেশে এখনও গঙ্গার উৎপত্তি স্থানে, নর্মদার তীরে তীরে মিলবে এরকম পবিত্র আত্মার। অবশ্য সাধু না হলে তো সাধু চেনা যাবে না।

নর্মদার তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে জালেশ্বর শিব দর্শনের পর অমরনালার পথে পড়ে দুর্গাধারা। এখানেই অবস্থান আত্মারামজীর। বয়স নব্বই পার হয়েছে কয়েকবছর হলো কিন্তু দেহে এবং মনে এখনও যুবক। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ইংরেজ পুলিশের গুলির চিহ্ন রয়েছে তাঁর শরীরে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মনে এলো চরম বৈরাগ্য। সেই থেকে তিনি ভগবানের সেবক। সমস্ত সংস্কারের পুঁটুলি ফেলে দিয়ে যে কায়মনবাক্যে শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারে সেই তো সন্ন্যাসী। নর্মদার তীরেই তিনি সাধনা করে চলেছেন সুদীর্ঘ বছর। 'বিবেক চূড়ামণি' গ্রন্থে আচার্য শঙ্কর বলেছেন— 'ভক্তিপ্রসিদ্ধা ভব মোক্ষনায়। নাত্র ততো সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ।' অর্থাৎ সাধনার শুরু ভক্তি দিয়ে, শেষও হয় ভক্তিতে। ভগবান ভক্তিডোরে বাঁধা। ভক্তির পুজোয় কোনও বিধি নিষেধ নেই। নর্মদার জালেশ্বরে রয়েছেন পুরী মহারাজ। অমরনালায়ও রয়েছেন একজন যোগীসাধক।

ওঁঙ্কারেশ্বরের পাগলাবাবাকে অনেকেই দেখেছেন। যারা নর্মদা পরিক্রমা করেছেন তাদের সঙ্গে পাগলাবাবার দেখা হওয়া উচিত। একজন মানুষ ঈশ্বরলাভের জন্য যেভাবে দিনরাত নির্জনে প্রার্থনা করে চলেছেন তা বুদ্ধির অগম্য। অমরকণ্টকেও পাগলাবাবাকে দেখা যায় মাঝে মাঝে। সাধারণ দেহাতি চেহারা। দেখলে ভক্তি আসবে না, কিন্তু সাধনার ভিত যথেষ্ট মজবুত। এই অঞ্চলের সাধারণ সাধুরা তাঁকে ভগবানের মতো মান্যতা দেয়। সত্যিই তিনি ভগবান। না হলে নর্মদার জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুক হিংস্র সাপেদের সঙ্গে নিয়ে তিনি থাকেন। বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গে একই গুহায় অবস্থান করেন। নিজ হাতে তাদের সেবাও করেন। বাঘে আর মানুষে একসঙ্গে থাকা কি সম্ভব? মানুষের যখন ভক্তি উদয় হয় তখন সে দেবতা হয়ে যায়, হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার— এসব তার কিছুই থাকে না। 'তপোভূমি নর্মদা' গ্রন্থের লেখক শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষালও একই রকম বাঘের সঙ্গে নর্মদার সাধকদের সহবস্থানের কথা লিখেছেন। সাধকেরা এ প্রসঙ্গে বলেছেন, আমাদের মনে হিংস্রতা আছে বলেই বাঘ ভাল্লুক আমাদের সঙ্গে হিংস্র আচরণ করে। মনের হিংস্রতা ত্যাগ করলেই অন্য প্রাণীও আর হিংসা করবে না। সকলেই তো ভগবানের সন্তান। যে ভগবানকে আপনার জন মনে করতে পারে— তার ভয় নেই। তার মৃত্যুও নেই। আসলে ভালবাসতে হয়, তাহলে গুণহীনও গুণবান হয়ে যায়। আর নর্মদার তট ধরে হাঁটলে বোধগম্য হবে যে ত্যাগ করতে পারে সে প্রকৃত সাধু। আসলি সাধুর জামার পকেট থাকে না। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য চাই। সংযম ত্যাগ তপস্যা চাই— তবে সাধু হওয়া যায়। পূর্ণত্যাগী না হলে তো ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ মিলন হয় না।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

একান্ত নিবেদনের একটি গান

বৈশাখের সাত তারিখ সেদিন। গ্রীষ্মের তাপ বাড়ছে। সকাল বিকেল বেশ মনোরম। দুপুরে সূর্যের প্রখর কিরণ সহ্য করাই কঠিন। তবু প্রকৃতির বিচিত্র রূপকে মেনে নিয়েই এগোন। কারণ সবই প্রয়োজন। প্রকৃতির খেলাঘরে প্রতিদিনই পালাবদল। একটা দিনের সঙ্গে অন্যদিনের মিল যতটা অমিল তার থেকে বেশি। সবটাই লক্ষ্য করেন কবি আবেগ আর আনন্দে। তাঁর জন্মদিন আসতে কদিন বাকি। বয়স বাহান্ন বছর। তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ বাইরে। শব্দের পিঠে শব্দ বসতে লাগল। কলম ধরলে কে লিখিয়ে নেন? যেই-ই লেখান তিনি তো আপনজন। সত্তার অন্যরূপ।

লেখা হয়ে গেলো প্রথম চারটে পংক্তি। 'আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি—/ আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যত বাণী।।/ আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,/ আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা— সব দিতে হবে।।' প্রথম বাক্যটাই লেখার জন্যে আগে ভাবা। ভাবনা এগিয়ে যেতে থাকল। পরের চারটে লাইন লেখা হয়ে গেলো। 'আমার প্রভাত, আমার সন্ধ্যা হৃদয়পত্রপুটে/ গোপন থেকে তোমার পানে উঠবে ফুটে ফুটে। এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার বাঁধা, / বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা— / সব দিতে হবে।।' সুর চলে আসছে। আরও কিছু কথা না লিখলে পুরো অর্থ ধরা দেবে না। লেখা হয়ে গেলো, 'তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভরে/ আমার করে নিয়ে তবে নাও যে তোমার করে।/ আমার বলে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে/ তোমার করে দেব তখন তারা আমার হবে— / সব দিতে হবে।' গান লেখা হয়ে গেলো কিছুক্ষণের মধ্যে। গানের বাণীকে ধরার আগে সুর এসে গেছে। সুরের সঙ্গে কথা বসেছে একটার পর একটা। কবি পুরো গানটা গাইলেন তিনবার। চারবার।

গানটা হারিয়ে যাবে না ধরা হয়ে গেছে সুরে। স্বরলিপি তৈরি হলে গান হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। গানটা নতুন করে লিখে ফেলে সুর যে জানে তাকে বলা, 'ধরে নাও।' স্বরলিপি তৈরি হয়ে গেলে গান তার কাঠামো পেয়ে যায়। পুরো গানটা গাওয়া হয়ে যায় একবার, দুবার, তিনবার।

গানটা লেখার অনেক বছর পর তা ডিসকে ধরা হয়েছে। কবির জীবনাবসান হয়েছে কয়েকবছর আগে। রেকর্ডিং হওয়ার আগে গায়িকা দুদিন কয়েক ঘণ্টা অনুশীলন করলেন। তানপুরা, এসরাজ, বেহালা ছাড়া তার কোনও বাদ্যযন্ত্র নয়। অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয়ে গেলো। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে রেশ রয়ে যায়। গানটা রেকর্ডিং-এর সময় তিনবার গাইলেন গায়িকা। যন্ত্রী ও প্রযুক্তিবিদরা অত্যন্ত যত্নে সব কাজ করলেন। ডিসক বেরিয়ে গেল। সঙ্গে আরও কয়েকটা গান রয়েছে। ডিসক সংগ্রহ করলেন অনেকে প্রকাশের দিনই। এক সংস্কৃতি অনুরাগী রবীন্দ্রগানের বড় সংগ্রাহক এবং সমঝদার শ্রোতা। নিজে অসুস্থ হলেও সংগ্রহের অসুবিধে নেই। তিনি প্রবীণ, প্রচুর পড়েন। লেখেনও। দায়িত্বও কম নয়। গানের সংগ্রহ ভালো। বৃদ্ধা মা-ও শোনেন। দোতলায় তাঁর ঘরে সন্ধেবেলায় মা এসে বসেন। চোঙওয়ালা গ্রামোফোন যন্ত্রে চাপানো হয় ডিসক। বাজতে থাকে, 'আমার যে সব দিতে হবে সেতো আমি জানি।' অসুস্থ ছেলে লক্ষ্য করেন মা একমনে শুনছেন। এ যেন তাঁরও মনের কথা। প্রার্থনার বাণী। সর্বস্ব নিবেদন তাঁকেই, যিনি সব দেন, আবার সব নেন। দেওয়া-নেওয়া সবই তো জীবন প্রবাহেরই নিয়ম। দেখলেন মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মা জানেন, তাঁর ছেলের বয়েস পঞ্চাশ। তার যে অসুখ করেছে তা সারবে না। বিদেশে চিকিৎসার জন্যে গেছেন, লাভ হয়নি। এদেশের স্বাস্থ্যকর স্থানে গেলেন হাওয়া বদলের জন্য। দাপট কমল না অসুখের। বাড়িতেই বিশ্রাম। তার মধ্যে পড়াশোনা। লেখালিখি। সময় কমে আসছে। মা-ও জানেন ছেলেকে ধরে রাখা যাবে না। স্বামী চলে গেছেন। ছেলেরা বড় হয়েছে। বড় ছেলে অসুস্থ, ছোট ছেলে মাকে দেখে। দাদাকেও। মা অসুস্থ ছেলের ঘরে বসে ভাবেন কত কথা। সেদিন গান শুনে কেঁদেছিলেন। মায়ের ওই অনুভব বুঝতে পেরেছিলেন ছেলেও। গানটি আরও দুবার শুনতে চাইলেন মা। সেদিন গান শেষ হওয়ার পর রেশ রয়ে গেল।

পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় পেরিয়েছে তারপর। কদিন আগে সেই একই ডিসক মন দিয়ে শুনল দেবজিৎ। রবীন্দ্রনাথের গান। পঞ্চাশবছর আগে গেয়েছেন বিখ্যাত গায়িকা। তিনিও এখন নেই। গানের কথা সুর একই। গায়িকার গাওয়া গানটি নতুনভাবে তৈরি। দেবজিৎ শুনল মন দিয়ে, 'আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি—'

মায়ের হঠাৎ মৃত্যুর পর এক সন্ধ্যায় তার দিদি পাপিয়া গানটা গাইতে গাইতে কেঁদে ফেলেছিল। তারপর চোখ মুছে আবার গায়। দেবজিৎ দেখল, মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে আছে বাবা। চোখ দিয়ে পড়ছে জল।

এখন গানটা মাঝে মাঝে গায় দেবজিৎ। এ যেন একান্ত নিবেদন।

নবাঙ্কুর

হোতু-কোতু উপাখ্যান

ছোটোদের সঙ্গে হোতুর কাজ

সপ্তাহের সাতদিনই হোতুর কাজ থাকে। ব্যবসার কাজ দেখার সঙ্গে ছোটোদের জন্যে তার ভাবনা রয়ে যায়। ছোটোদের জন্যে ছোটোদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ সকলে পায় না। পেলেও কাজ করার মন থাকে না। ছোটোদের জন্যে কাজ করার জন্যে মনকে তৈরি করতে হয়। হোতু মনে করে এটা তার কাছে অন্যরকম পাওয়া। নিজের ছেলেবেলা খুঁজে নিতে চায় ছোটোদের মধ্যে। একটু দুষ্টু ছেলে দুচারজন থাকলেও তাদেরও সামলে নেওয়া যায়। ছোটোরা যখন হইচই করে মন ভরে ওঠে হোতুর। শুধু বলে, 'পড়ে যাস না হুটোপাটি করতে করতে।' হোতু দেখেছে, যারা হইচই করছে তারাই একবারে শান্ত হয়ে গল্প শুনছে, গান গাইছে, ছবি আঁকছে। নরম গলায় আবৃত্তি করছে। নিজেরা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচে তালিম নিচ্ছে। তারই ফাঁকে একজন অন্যজনকে একটু রাগিয়ে দিচ্ছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাব করে নিয়ে নিজেদের কাজ করছে। হোতুর সব দেখে মনে হয় নদীর ঢেউয়ের মতো আনন্দে ভেসে চলেছে।

রবিবার একসঙ্গে অনেকক্ষণ কাটে। সকাল আটটা থেকে শুরু হয় শেখানো। সাড়ে সাতটার মধ্যে হোতু হাজির হয়। আরও কয়েকজন। দিনের কাজ শুরুর আগে তৈরি হওয়ার ব্যাপার থাকে। ছোটোদের নিয়ে কাজ বলে নজর রাখতে হয় সবদিকে। যারা শেখায় তারা এসে যায় আটটার মধ্যে। কারও দেরি হলে জানিয়ে দেয় একটু পরে যাচ্ছি। ছেলেমেয়েরা এসে যায় ঠিক সময়ে। বাবা মা কিংবা বাড়ির কেউ পৌঁছে দিয়ে যাওয়ার সময় জেনে নেয় কখন ছুটি হবে। বাড়ির কাউকে ধারে কাছে বসতে দেওয়া হয় না। বলা রয়েছে, 'তিন ঘণ্টা ছোটোরা আমাদের কাছে থাকবে। তাদের শরীর হঠাৎ খারাপ হলে বাড়িতে খবর দেওয়া হবে। প্রত্যেকের দিকে বিশেষ নজর থাকবে। ছুটির পর একে একে সবাই বাড়ি যাবে। যেদিন আগে ছুটি হবে তা জেনে নিতে হবে।'

ছোটোরা এখানে আনন্দ শেখে। কত মজা। একটুও বকুনি নেই। কড়াকড়ি নেই কোনও ব্যাপারে। শেখা আনন্দে। কোনও পরীক্ষা নেই। পড়া ধরে না কেউ। অথচ কত গল্প বলে। সুন্দর করে শেখায়। প্রথম এসে কেউ কেউ কাঁদে, তারপর মেতে ওঠে। অন্যদের বলে 'আমাদের এখানে শুধুই মজা আর আনন্দ।' ওরা যখন বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে তখন অন্যরকম চেহারা নেয়। দুচোখ ভরে দেখতে হয় ওদের কাজ। ছোটোদের জন্যে হোতুর ভাবনা সবসময়েই থাকে। প্রতিদিন কিছু চকোলেট কেনে। ছোটোরা পেয়ে যায়। চক চায় তারা। একটা চকখড়ি পেলে কত খুশি। নানারকম এলোমেলো জিনিস দিয়ে পুতুল খেলনা তৈরি করতে শেখায় চন্দনকাকু, সরলাদিদি। হোতুকে এটা ওটা সেটা উপহার দেয়। হোতু সেগুলো জমিয়ে রাখে।

হোতু আনন্দ ছড়িয়ে দিতে চায় সকলের মধ্যে। আনন্দ পাওয়ার জন্যে সব কাজ। প্রতিদিনই ক্যামেরা নিয়ে আসে অর্জুন। ছোটোদের বিভিন্ন মেজাজের ছবি তুলে রাখে। জন্মদিনে প্রত্যেককে ছবি দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। জন্মদিনে চকোলেটও দেওয়া হয়। হোতু এভাবেই ছোটোদের কাছে পৌঁছে যেতে যায়। সে চায় সকলে মিলে মেতে ওঠার কাজ চলুক দিনের পর দিন। ছোটোরা যদি ঠিকমতো শেখার পরিবেশ পায় তাহলে বড়োদেরও মন ভরে উঠবে। হোতু সকলকে বলেছে, 'এসো মন দিই ছোটোদের কাজে।'

ছোটোদের জন্যে বইয়ের প্রদর্শনী হয় বছরে দুবার। ইংরেজি বছরের শেষে একবার। আর একবার বাংলা বছরের শুরুতে। বই পড়ার মজাটা হোতু সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়। ছবি আঁকার মজাও থাকে বইয়ের মধ্যে। বই চারদিকে সাজানো হয়। অনেকরকম বই। ছোটোরা বেছে নেয়। একটা বাঁধানো খাতা রয়েছে। তাতে সাঁটা হয় ছবি একটার পর একটা। ছোটোরা বই নিয়ে পোস্টার তৈরি করে তা টাঙানো হয়। রঙে রঙে চারদিক ভরে ওঠে। বইয়ের প্রদর্শনী থেকে বই বেছে নেয় ছোটোরা। দুটো করে বই পায় সকলে। বই বেছে নেওয়া হয় আগে থেকে। তালিকা তৈরি হয় তার আগে। এছাড়া রয়েছে গাছের প্রদর্শনী। ছোটোরা গাছ ভালোবাসে। নানারকম গাছ এনে সাজানো হয়। গাছগুলো ছোটোদের নরম হাতের ছোঁয়া পেয়ে আনন্দে নেচে ওঠে। অনেকেই গাছ যত্নে রাখে বাড়ি নিয়ে গিয়ে। গাছ উপহার দেওয়ার সময় বর্ষাকাল। গাছে গাছে সমস্ত জায়গাটা ভরে ওঠে। অর্জুন ছবি তোলে একটার পর একটা।

ছোটোরা কেমন গল্প বলে তাও শুনতে চায় হোতু। ওরা বই পাওয়ার পর খাতায় লিখে রাখে কেমন লাগল। একটার পর একটা বই নেড়েচেড়ে দেখার মজাও আলাদা। কারও কারও জন্মদিনে হোতু বইও উপহার দেয়। বাংলা বই উপহার দিতে চায় বেশিরভাগ সময়। কখনও কখনও ভালো ইংরেজি বইও কেনে। হোতু মনে করে বইয়ের খোলা জগৎ ছোটোদের সামনে অনেককিছু হাজির করতে পারে।

ছোটোদের সঙ্গ হোতুকে আনন্দ দেয় সবসময়। এই আনন্দ সে হারাতে চায় না।

কৌশিক গুহ

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

বই আর দুই ভাইবোন

দুই ভাইবোনে যেমন ঝগড়া, তেমনি ভাব। মা মেয়েকে বলে, 'দাদার কাছে মারও খাবি, আবার তাকে রাগাবি!' সামান্য কারণে ওদের ঝগড়া। বোন কান্নাকাটি করলে মা বকে দাদাকে। মাঝে মাঝে বাবার কাছেও মার খায় দাদা। বোন সামনে বাবাকে এসে বলে, 'দাদাকে মারবে না। বকো তুমি।' মেয়ের শাসন সমসময় মানে। মা বাবা দেখে দুজনে মন দিয়ে কোনও বই পড়ছে। ছবি দেখছে। পিসি আর পিসতুতো দাদা প্রায়ই আসে। দাদাভাই খুব ভালোবাসে মামাতো ভাইবোনকে। তবে বোনের সঙ্গে তার ভাব বেশি। বোনের কথা শোনে। তাকে গল্প বলে। ভাইয়ের সঙ্গে আগে ঝগড়া হোত। মা বলত, 'তোরা কোনও নালিশ করবি না আমাদের।' ওদের 'এই ভাব আর এই ঝগড়া' ব্যাপার-স্যাপার থেকে মজা পায় বড়োরা। ওরা স্কুলে গেলে বাড়ি চুপচাপ। বেশিক্ষণ ভালো লাগে না কারও। দাদাই ছটফট করে কখন দুজন ফিরবে। নাতনি আগে ফেরে, নাতি পরে। ফেরার পরই বাড়ি মাতিয়ে দেয় হইচই করে। এর মধ্যে পিসেমশাই নিয়ে আসে কয়েকটা বই। খুব খুশি হয়। যখন ঠাকুমা ছিল কত গল্প বলত। মন দিয়ে গল্প শুনত ওরা। ঠাকুমার ফাঁকা জায়গাটা কেউ ভরাট করতে পারেনি। দাদাই খুব কম কথা বলে। তবে বই আনে, উপহার দেয়। মজার বই উপহার দিলেও বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে পারে না। ওরা আগে যেখানে থাকত সেখানে একটু অসুবিধে থাকলেও গাছ ছিল। কত পাখি আসত। হাওয়া আর রোদ খেলা করত। খোলামেলা। ছোটাছুটি করা যেত। কত চেনা লোকজন। তারা ভালোবাসত। গল্প করত। এই ফ্ল্যাট বাড়িতে সুবিধে কিছু থাকলেও অসুবিধে অনেক। পিসি পিসেমশাই দাদাভাইরা এলে দুই ভাইবোন বলে, 'আরও কিছুক্ষণ থাকো।' পিসেমশাই বলে, 'তোদের পিসি আর দাদাভাই রাতে থাকবে। আমাকে যেতে হবে।' পিসেমশাইকে যেতে দিতে ইচ্ছে না করলেও হাত নেড়ে বিদায় জানায়। বলে, 'আবার আসবে। বই আনবে।'

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. ২০১২ সালের সরস্বতী সম্মান পেয়েছেন কে? কোন্ ভাষায় লেখক? বয়স কত? বইয়ের নাম? পুরস্কারের অর্থমূল্য কত? পুরস্কার কারা দেন?

২. 'গুপীগাইন বাঘা বাইন' চলচ্চিত্রে গান গেয়েছিলেন কে? গীতিকার সুরকার কে?

৩. 'দাদাঠাকুর' চলচ্চিত্রে মূল ভূমিকায় কে অভিনয় করেন?

৪. 'সন্দেশ' পত্রিকা নতুনভাবে প্রকাশনার সময় সত্যজিৎ রায়কে সহযোগিতা করেন তাঁর কোন্ বন্ধু? নামী কবি?

৫. 'সুখলতা রাও'-এর ডাকনাম কি ছিল? কোথা থেকে নেওয়া?

উত্তর ১. সুগাথাকুমারী। মালয়ালাম। ৭৯ বছর। 'বালিতে লেখা'। ১০ লক্ষ টাকা। কে কে বিড়লা ফাউন্ডেশন। ২.অনুপ ঘোষাল। সত্যজিৎ রায়। ৩. ছবি বিশ্বাস। ৪. সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ৫. হাসি। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' থেকে।

ছবিতে তফাত খোঁজ

উলটো পালটা

আশু ঘোষাল হাসপাতালের কম্পাউন্ডার। খুব দক্ষ নিজের কাজে। ডাক্তারবাবু আর রোগীরা তাঁর উপর ভরসা করেন। ঠিক সময়ে হাসপাতালে হাজির হন। দুপুর পেরিয়ে যায় রোগীর চাপ থাকায়। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে চলে যান লক্ষ্মী সাহার সরবতের দোকানে। কারও সঙ্গে কথা না বলে খেতে শুরু করেন। সপ্তাহের দুটো দিন। শনি আর মঙ্গলবার। সেদিন খেয়েদেয়ে ফেরার সময় রাস্তার ধারেরএক পাঁচিলে বারবার লাথি মেরে বললেন, 'দরজা খোল। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো।' সকলে মজা দেখছিল। একটি ছেলে বলল, 'এটা দরজা নয় পাঁচিল।' আশু বললেন, 'তুমি যখন বলছো মানছি।' লক্ষ্মী সাহার সরবতের দোকান পরে উঠে যায় ছোটোদের উদ্যোগে। আশু ঘোষাল কিছুদিন ছটফট করলেও পরে সব মেনে নেন।

২

বেনিয়াটোলার ব্যাগওয়ালা রূপক দাঁ ভালো ব্যাগ তৈরি করে। অমিতকে বলেছিল, 'পুরনো প্যান্ট দিও। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ তৈরি করে দেবো।' অমিতের বাবা মোটাসোটা লোক। তাঁর বাতিল প্যান্ট দিয়ে এলো। কদিন ঘুরিয়ে ব্যাগ দিল একটা। মজুরি নিলো একশো টাকা। দিনকয়েক বাদে অমিতের সঙ্গে দেখা সুগতর। একইরকম ব্যাগ তার কাঁধে। জিগ্যেস করতে জানতে পারল রূপক দাঁ-দের দোকান থেকে কিনেছে দেড়শো টাকা দিয়ে। অমিত বুঝল, রূপক তার দেওয়া প্যান্ট থেকে দুটো ব্যাগ তৈরি করেছে। একটা তাকে দিয়ে অন্যটা বেচে বাড়তি দেড়শো টাকা রোজগার করেছে। অমিত ঠিক করল রূপক দাঁয়ের দোকানে আর কোনওদিন কিছু করতে দেবে না।

রামগরুড় সংকলিত

স্বর্ণালি বৈশাখে

বিদিশা ভট্টাচার্য

"এসো হে বৈশাখ এসো এসো"... আমি বাংলায় গান গাই আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। খুঁজতে তো চাই, কিন্তু খুঁজে কী পাই। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে কাজকর্মে ইংরেজী সন তারিখটাই বেশি লাগে তাই হয়তো বাংলাটা সরগড় হয় না। যাইহোক, নববর্ষের প্রভাতে চায়ের কাপের সঙ্গে খবরের কাগজ-এ ডেট লাইটা চোখ বোলাতে হয়, কারণ বাংলা-ইংরেজী দুটোকেই মুখস্থ করতে হবে। ১লা বৈশাখ মানেই চৈত্র সেলের গন্ধ। আর তার টানেই বাড়ির কর্ত্রীদের রান্নাঘরের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে কখন যাবে সেই দিকেই ঝোঁক। পঞ্চব্যঞ্জন রান্না করে পরিবারের মানুষের মুখে হাসি ফোঁটানো এই থাকে গৃহিণীদের প্রথম ইচ্ছা। আর বাড়ির ছোটোদের সোনার দোকান থেকে কার্ডের প্রাপ্তি আর বাড়ির পুরুষদের পকেটের টান। নববর্ষের ১লা তারিখে সাধারণ ঘটনা। এই সাধারণের মাঝেই খুঁজে বের করা যাক অসাধারণ সেইসব নারীদের যাঁরা রাঁধেন আবার চুলও বাঁধেন। তাঁদের সময়ে এবং এখন কিভাবে কাটান সে বিষয়ে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় জানালেন, "৪৮-৪৯ সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে এদেশে আসা। প্রচণ্ড অভাবে কেটেছে জীবন। তবুও বৈশাখের সন্ধ্যার আনন্দ ভোলার নয়। সোনার দোকানে গিয়ে গয়না বানানো। পরে তা বন্ধকী কাজে আসবে এই আশায়। দশ বোনের সংসার। বাবা ছিলেন স্টেশন মাস্টার। তবুও তার মধ্যে এই দিনের সমস্ত আনন্দটুকু পুষিয়ে নিতাম। সকালে উঠে গুরুজনদের প্রণাম, লক্ষ্মী-গণেশের পুজো— এইভাবে কেটেই যেত দিনটা।

সুপ্রিয়া চৌধুরী— বাবা, মা, ছয় দিদি, দুই দাদার সংসার। নববর্ষের নব-হরষে মেতে ওঠা সে এক অভিনব ব্যাপার। বাবা নিয়ে যেতেন দোকানে, নানারকম জামাকাপড় কিনে দিতেন। কিন্তু যেহেতু গয়নায় আমার কোনওদিনই শৌখিনতা ছিল না, তাই সেই দিকে নজর দিতাম না, যখন নিজে রোজগার করতে শিখলাম তখন দিদির জেদে সোনা কেনা। আবার উত্তমদার থেকে প্রত্যেক বছর এই দিনে একটা দুর্দান্ত উপহার বাঁধা থাকত।

ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়— ১লা বৈশাখ মানেই গয়না কেনা, মা-ঠাকুমার হাতে ভালমন্দ রান্না খেয়ে নতুন জামা পরে বিকেলে বেরিয়ে পড়া দোকানে দোকানে। তারপর টেলিভিশনে প্রোগ্রাম দেখা। একটু বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান, তখন সেভাবেই কেটে যেত দিনগুলি। এখনও তাই হয়।

শ্রীলেখা মিত্র--- আমাদের পরিবার ঐতিহ্যশালী। তাই ট্র্যাডিশন্যালওয়েতে পালন করা হোত এই দিনটি। মা এই দিনটি মিষ্টির প্যাকেটের সঙ্গে সঙ্গে খুব গয়নাও কিনতেন। কারণ এসময় সব দোকানেই বিশেষ ছাড় পাওয়া যায়। বর্তমানে তো গয়না কেনার থেকে ১লা বৈশাখটা হয়ে গেছে শুধু অনুষ্ঠান করা। বুঝতেই পারি না কখন এল ও কখন গেল।

গার্গী রায়চৌধুরী (অভিনেত্রী)— ১লা বৈশাখ মানেই চৈত্র সেলে চুটিয়ে শাড়ি কেনা। তবুও বাড়িতে ঘরোয়া অনুষ্ঠান হোত। নাকছাবি জমানো আমার বিশেষ শখ। এখন অনেক দোকানে সেইদিন বিভিন্ন অফারের সঙ্গে নাকছাবি উপহারের রীতি হয়েছে। আর সেই সুবাদে নাকছাবি জমানো আমার একটা প্যাশন।

শর্বরী দত্ত (পোশাক ডিজাইনার)— আমার বাবা ছিলেন প্রফেসর। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে আমি। পরবর্তীকালে ১লা বৈশাখে আমার পতিদেব সোনা আর হীরের গয়না উপহার দিয়েছেন। এই দিনটার অপেক্ষায় থাকতাম, মনে হোত কবে ভালোবাসার মানুষটির হাত থেকে গয়না পাবো। বছরের প্রথম দিনেই এই উপহার। না জানি কেমন যাবে গোটা বছরটা।

এতো গেল কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা। কিন্তু মনে হতেই পারে নববর্ষের আলোচনায় বারবার সোনার কথা ফিরে আসছে কেন? আর আসবে নাই বা কেন? অতীতের নারীর এই দিনটিতে উদ্যাপন পদ্ধতি ছিল আলাদা। লালপেড়ে গরদের শাড়ি, পায়ে আলতা, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, কপালে সিঁদুরের টিপ, পিঠে চাবির গোছা, আর লক্ষ্মী- গণেশের আরাধনা। যাতে সংসারে মঙ্গল হয়, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বাড়ির পুরুষেরা লাল খাতা পুজো করতেন, মন্দিরে গিয়ে মঙ্গল কামনায় ব্যস্ত থাকতেন। এখন কিছুটা হলেও এর স্বাদটা বদলেছে। পুজো-পদ্ধতি একই থাকলেও কিন্তু বদলেছে ভাবধারা, মানসিকতা, সাজ-সজ্জা। এখন কোথায় গরদের লালপেড়ে শাড়ি, কোথায় সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর! এখন যে নারীরা সেইদিনও ব্যস্ত থাকে ১০টা-৫টা কর্মজীবনে। সেইদিনও ছুটি নেই। তারই মধ্যেই বাহ্যিক সজ্জা না থাকলেও আন্তরিক ভালবাসায় সবসময়ই মাউসের বটমে বা খাতায় পেন ঠুসে সংসারের জন্য মঙ্গল কামনায় সদাই নিযুক্ত থাকে। আর থাকবে নাই বা কেন? তারাই যে জ্যান্ত ধনলক্ষ্মী। সব ধনলক্ষ্মীদের নববর্ষ নতুনভাবে, নতুন ভোরে, নতুন সূর্যের আলোয় আলোকিত হোক— এই কামনা করি। তাই সব শেষে রবিঠাকুরের সেই গান দিয়েই পরিসমাপ্তি ঘটানো যাক এই স্বর্ণালী বৈশাখকে।

"নব আনন্দে জাগো, আজি
নব রবি কিরণে..."

অতিথি কলম

ক্ষমার আবেদন শুধু সমাজের সুবিধাবাদীদের জন্যই

স্বপন দাশগুপ্ত

অন্তত একজন ঐতিহাসিকের প্রস্তাব মতো বৃটিশ সাম্রাজ্য অলংকরণ তত্ত্বের (ornamentalism) ওপর দাঁড়িয়ে— বড় বড় ব্যক্তিদের জন্য গুরুগম্ভীর অভিধা, তাঁদের তোষণ, পোষণ সবই বৃটিশ শাসনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। দেশীয় খ্যাতনামা ব্যক্তিরা যাঁরা বৃটিশ সরকারের আধিকারিকরূপে কাজ করেছেন তাঁরা বিভিন্ন সময়ে সরকারি খেতাব কুড়িয়েছেন (অবশ্য এসব ক্ষেত্রে মহিলারা প্রায়ই উপেক্ষিত)। বৃটিশরা জানত যে, ভারতীয়রা একটু বেশি মাত্রায় আড়ম্বরপূর্ণ খেতাব প্রভৃতি পছন্দ করে। বৃটিশদের প্রতি এইসব ব্যক্তিদের আনুগত্যের ভূষণ ছিল নাইটহুড, রায়বাহাদুর, খান বাহাদুর প্রভৃতি খেতাব--- এঁরা সমাজের অগ্রণীরূপে গণ্য হোত বলে দেওয়ানি আদালতে এঁদের উপস্থিত না হলেও চলত।

স্বাধীন ভারতেও আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেই ঐতিহ্য অযাচিতভাবে ধারাবাহিকভাবে সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলেছি। লর্ড ম্যাকলের প্রণীত ভারতীয় দণ্ডবিধি আমরা মেনে নিয়েছি বৃটিশরাজের প্রতি আমাদের অবজ্ঞার মনোভাব থাকা সত্ত্বেও। বাস্তবে আমাদের বর্তমান শাসকরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। যাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুগত তাঁদের প্রতি নরম মনোভাব দেখানোই যেন আমাদের শাসকবর্গের রেওয়াজ। সঞ্জয় দত্তকে অস্ত্র আইনে দোষী সাব্যস্ত করে সুপ্রীম কোর্ট শাস্তি প্রদান করায় দিল্লী এবং মুম্বাইয়ের এক বিশিষ্ট মহলের অসন্তোষ যেন তারই ইঙ্গিতবাহী।

বহু বলিউড চিত্রনির্মাতার যাঁরা ইতিমধ্যে সঞ্জয় দত্তের অভিনীত কিছু নির্মীয়মান ছবিতে টাকা ঢেলেছেন তাঁদের অসন্তোষের কারণ তবুও বোধগম্য হয়। তাঁর পরিবারের জন্য সহানুভূতি জ্ঞাপন করাও যুক্তিযুক্ত। তাঁর বোনও (যিনি কংগ্রেসের মুম্বাইয়ের এক সাংসদ) দাদার এই শাস্তিতে ভেঙ্গে পড়েছেন এবং সর্বোপরি তাঁর পিতা সুনীল দত্ত ও মা নার্গিস দুজনেই বিশিষ্ট নাগরিক এবং জনমানসে তাঁদের বিশেষ স্থান রয়েছে এমন পরিবারের পক্ষে তাদের একজনের এরকম শাস্তি সত্যিই দুঃখজনক।

মুম্বাই বিস্ফোরণ (ফাইল চিত্র)।

এমন ঘটনায় কারও প্রতি সমবেদনা জানানো যেমন যুক্তিসঙ্গত, তেমনি এই বিষয়টি জননীতি প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত করা আবার অযৌক্তিক। এই বিরাট পার্থক্য এবং তার সঙ্গে যুক্ত আইনের চোখে সবাই সমান— এই নীতি যেন প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কাটজু এবং সেইসঙ্গে সঞ্জয়ের বন্ধুবর্গের কাছে অবহেলিত ও অযৌক্তিক। আরও এক ধাপ এগিয়ে কাটজুর সওয়াল— জনপ্রিয় বলিউডি সিনেমা গান্ধীগিরিতে সঞ্জয় দত্তের ভূমিকাকেও যেন শাস্তি ঘোষণার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়। রাজনীতির কিছু খিলাড়ীও কাটজুর যুক্তিকে সমর্থন জানিয়েছেন।

আর আইনমন্ত্রী অশ্বিনীকুমার নিজে এ বিষয়ে মন্তব্য না করে বলেছেন যে, ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা একমাত্র মহারাষ্ট্রের বর্তমান রাজ্যপাল বি. শঙ্করানন্দের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু শঙ্করানন্দ একজন রাজনীতিবিদ এবং যিনি বহুবছর কংগ্রেসী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত, তাই অশ্বিনীকুমারের ইঙ্গিতবহ রাজ্যপাল মহোদয় ‘করবেন’ (will) কথাটি এতটাই মাত্রা পেয়েছে যে, অনেকেই ভাবছেন সঞ্জয়ের ক্ষমা প্রদর্শের বিষয়টা যেন পূর্বনির্ধারিত।

আইন সম্পর্কে মি. বাম্বলের (M. Bymble) বিখ্যাত উক্তি— আইন হলো ‘গাধা’--- ক্ষমা প্রদর্শনের বা ক্ষমা পাওয়ার ক্ষেত্রে কে যোগ্য বা অযোগ্য সে বিষয়ে যেন আইন উদাসীন, কিন্তু সুবিচারের ক্ষেত্রেও যেন তার চোখ বাঁধা। না হলে সঞ্জয় দত্তের জন্য একপ্রকার আইন, একই অপরাধের জন্য অন্য অপরাধীদের ক্ষেত্রে অন্য আইনের প্রয়োগ কীভাবে হতে পারে? যদি সঞ্জয় দত্তকে তাঁর অপরাধের জন্য রেহাই দেওয়া হয় তবে ১০ জন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ইয়াকুব মেমন কেন রেহাই পাবে না?

এক্ষেত্রে জরুরী, সঞ্জয়ের অপরাধের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখা উচিত।

সে একজন শিল্পী সমাজের বিশিষ্ট দম্পতি সঞ্জয়-নার্গিসের পুত্র— এই হিসেবে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়নি। তাঁর অপরাধ গুরুতর, কারণ তিনি তাঁর পরিবারের গরিমাকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান প্রেরিত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিজের কাছে রেখেছেন যা তাঁর হাতে পৌঁছে দিয়েছে আণ্ডারওয়ার্ল্ডের কিছু ব্যক্তি। যে অস্ত্র কাজে লাগিয়ে ১৯৯৩ সালে মুম্বাই বিস্ফোরণে ২৫৭ জন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। বোম্বাই-এর সেই বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন ৭১৩ জন। সঞ্জয় যে শুধু এ কে-৫৬ রাইফেল এবং ০.৯ মিমি পিস্তল নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে র‍্যাম্বোর সঙ্গে তুলনা করেছেন তাই নয়, বরং তিনি প্রত্যক্ষভাবে ওই গণহত্যাকে মদত দিয়েছেন যা ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর সংঘটিত পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদীদের হত্যালীলার চেয়ে গুরুত্বের বিচারে কম নয়।

স্পষ্টত, সরকারি কৌসুঁলির দাবি ছিল, সঞ্জয়কে 'টাডায়' অভিযুক্ত করা হোক। সেই পথে না হেঁটে কোনও অজ্ঞাত কারণে সিবিআই টাডা প্রয়োগ না করে সাধারণ অস্ত্র আইনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চালালো যার সাজা অনেক কম। এখন শীর্ষ আদালত চূড়ান্ত শাস্তি ঘোষণা করায় তার বিরুদ্ধে শোরগোল শোনা যাচ্ছে।

১৯৯৪ সালে সঞ্জয় দত্তকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় দাউদ চক্রের সংঘটিত সন্ত্রাসবাদের একজন ক্রীড়নক হিসেবে, তখন আমি বাল থ্যাকারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। তখন তিনি গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আমি খুব বিনীতভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, তিনি কেন সঞ্জয়ের প্রতি নরম মনোভাবের কথা বলছেন। তাঁর তৎক্ষণাৎ উত্তর ছিল— সঞ্জয়ের প্রাপ্য তিনটি সপাট চড়।

সাধারণভাবে ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে শাস্তি হিসেবে টাইগার (বাল থ্যাকরে) দ্বারা সপাটে তিনটি চড়ই হয়ত যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সঞ্জয়ের অপরাধ কোনও মহিলাকে টিপ্পনি (ইভটিজিং) করার মতো তুচ্ছ ঘটনা নয়। সে জেনে বুঝেই গণহত্যায় অংশগ্রহণ করেছিল। সরকার তার এই কাজকে বেপরোয়া গাড়ী চালানোর মতো অপরাধ বলে ভাবতে পারে। কিন্তু আমরা কি এসব ভুলে গিয়ে বাধিত হবো?

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

নেত্রদান মহাদান
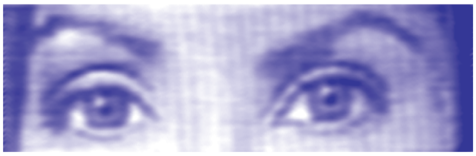
EYE BANK
23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451
অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387
সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®
নিখুঁত লেখার খাতা

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature........ কলাম।
PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane(1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0556
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net
PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

কর্ণাটকের নির্বাচনে জাতপাত একটা বড় ফ্যাক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কর্ণাটকে বিধানসভার নির্বাচন একেবারে দোরগোড়ায়— ৫ মে রবিবার। একমাসও আর বাকি নেই। সব দলই জেতার জন্য নিজেদের জাল বিছোচ্ছে। সব দলেই নেতারা নিজেদের গোষ্ঠীর তাকত বাড়াতে তৎপর। কংগ্রেসের লিঙ্গায়েত নেতারা পার্টির হাইকমান্ডের কাছে একটি প্রতিনিধি

জগদীশ শেট্টর

দল পাঠিয়ে ৬০ জন প্রার্থীর জন্য টিকিটের দাবি জানিয়েছেন। আবার জনতাদল সেকুলার পার্টির নেতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়া এবং তাঁর পুত্র তথা দলের সভাপতি এইচ ডি কুমারস্বামী আজমীরে তীর্থ করতে গেছেন। উদ্দেশ্য একটাই— সংখ্যালঘুদের ভোট।

কর্ণাটকে বিজেপির নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতি প্রহ্লাদ যোশী জানিয়েছেন, লিঙ্গায়েত ভোটব্যাঙ্কে ভাঙন ধরাতে কংগ্রেস প্রাক্তন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী ও লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের নেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। অন্যদিকে ইয়েদুরাপ্পার বক্তব্য হলো তাঁর সমর্থন ছাড়া নাকি বিজেপি ৫০টি আসনেও জিততে পারবে না। নির্বাচনে জেতার জন্য সব দলের 'ব্লু-প্রিন্ট'-তেই জাতপাতের একটা অদৃশ্য অঙ্ক আছে। এভাবেই দলগুলো তাদের কৌশল ও প্রার্থী ঠিক করেছে।

লিঙ্গায়েত ও ভোক্কালিগা— কর্ণাটকের দুই পরস্পর জাতিগোষ্ঠীর পুরো সমর্থন না পেলে হালে যে পানি পাওয়া যাবে না কংগ্রেস একথা ভালোভাবেই জানে। কর্ণাটকেও মোট জনসংখ্যা ৬ কোটি। মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ লিঙ্গায়েত আর ১৩ শতাংশ ভোক্কালিগা। ২২৪ আসনের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য

ইয়াদুরাপ্পা

এই দুই গোষ্ঠীর সমর্থন জরুরি তা কংগ্রেস কেন, সব দলই বোঝে। এছাড়া ওবিসি-র ৩৩ শতাংশ, তপশিলী জাতি ও উপজাতি ২৩ শতাংশ এবং সংখ্যালঘু শ্রেণীর ১০ শতাংশ ভোটার রয়েছে। কংগ্রেস যে লিঙ্গায়েত গোষ্ঠীর ভোট টানতে উঠে পড়ে লেগেছে তার প্রমাণ হলো গত বছর এপ্রিলে খোদ সোনিয়া গান্ধী লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক গুরু শিবকুমার স্বামীর ১০৫তম জন্মবার্ষিকীতে যোগ দিতে টুমকুরে ছুটে গিয়েছিলেন। যদিও লিঙ্গায়েতদের সঙ্গে ইতিপূর্বে কংগ্রেস যে ব্যবহার করেছে সেটা তারা বোঝে না এমন নয়।

এস নিজালিঙ্গাপ্পা ও বীরেন্দ্র পাতিল-এর মতো লিঙ্গায়েত মুখ্যমন্ত্রীদের কংগ্রেস একদা কোণঠাসা করেছিল। শুধু তাই নয়, নির্বাচনী অভিযান পরিচালনার জন্য কংগ্রেস যাকে বসিয়েছে, সেই বীরান্না মাথিকাট্টি-রও তেমন কোনও জনভিত্তি নেই— নিতান্তই ছোট মাপের এক নেতা।

অন্যদিকে বিজেপি আশা করছে, মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ শেট্টার এবং লিঙ্গায়েত গোষ্ঠীপতিদের সমর্থনে দল নিজেদের ঐতিহ্যগত ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে পারবে। যদিও দলের নবনিযুক্ত সভাপতি প্রহ্লাদ যোশী অভিযোগ করেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা কংগ্রেসের হাতের

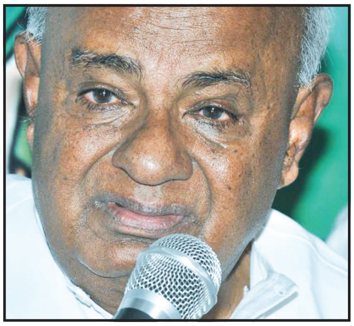

দেবেগৌড়া

পুতুল হয়ে বিজেপির লিঙ্গায়েত ভোটব্যাঙ্ক-কে ভাঙতে চাইছেন। তিনি অবশ্য মনে করেন, বিজেপি সব সম্প্রদায়েরই সমর্থন পাবে। বিজেপি ওবিসি, তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের ভোটকে এবারে টার্গেট করেছে। কেননা, গত পাঁচ বছরে বিজেপি সরকার ওবিসি, তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

বিজেপি-সভাপতির অভিযোগ যে মিথ্যা নয় কে জে পি নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান ধনঞ্জয় কুমারের কথাতেই তার প্রমাণ মিলছে।

তিনি বলেছেন, কে জে পি ভালো ফল করতে ব্যর্থ হলেও কংগ্রেসকে সমর্থন করবে। জাতপাতের অঙ্ক, প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া এবং দুর্নীতি— এইসব বিষয়গুলিকে এড়িয়ে কর্ণাটকের নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত কে চওড়া হাসি হাসবে তা ফল বেরনোর পরই জানা যাবে।

সর্বশিক্ষা অভিযানে টাকার শ্রাদ্ধ

সারাদেশে প্রায় ১১ লাখ শিক্ষকের পদ খালি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ২০০৯ সালে 'সকলের জন্য শিক্ষা' বা 'শিক্ষার অধিকার' (রাইট টু এডুকেশন) আইনটি আনা হয়েছিল ছয় থেকে চৌদ্দ বছরের সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে অবৈতনিক পড়াশুনার সুযোগ দেওয়ার জন্য। তাতে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ভিত্তিক শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, র‍্যাম্প, পানীয় জল, শৌচাগার ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি পরিকাঠামো নির্মাণ করতে হবে বলে স্থির হয়। এই প্রসঙ্গে প্রথম পর্যায়ের প্রথম সময়সীমায় (৩১ মার্চ, ২০১৩) রাজ্যগুলির অগ্রগতি দেখে নেওয়া যেতে পারে।

শিক্ষক সুমারি
অনুমোদিত শিক্ষকপদ ৫২ লক্ষ।
শূন্য পদ রয়েছে ১১ লক্ষ।
৮.৬ লক্ষ শিক্ষক আনট্রেনড্ (প্রশিক্ষণহীন)
পশ্চিমবঙ্গে ১.৯৭ লক্ষ প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক, সর্বোচ্চসংখ্যা
সারাদেশে ৫৯ শতাংশ স্কুলে সঠিক ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত আছে।
বিহারে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১৪.৮ শতাংশ যা সর্বনিম্ন।

শিক্ষকের গুণমান : ৫ জনের মধ্যে ১ জনের ট্রেনিং নেই। সারাদেশে ৫২ লক্ষ শিক্ষক পদের মধ্যে এখনও ১১ লক্ষ খালি আছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া রাজ্যগুলির পক্ষে খুবই চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। কারণ ৮.৬ লক্ষ অর্থাৎ ২০ শতাংশ শিক্ষক এখনও আনট্রেনড্। যদিও অধিকাংশ রাজ্য শিক্ষকের ন্যূনতম যোগ্যতার পরীক্ষা নিয়েই স্কুল চালাচ্ছে। এই রাজ্যগুলি হলো কর্ণাটক, জম্মু-কাশ্মীর, মেঘালয়, গোয়া, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম ও ত্রিপুরা। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যাটা সর্বোচ্চ। ১.৯৭ লক্ষ শিক্ষক আনট্রেনড্ অর্থাৎ প্রশিক্ষণহীন। এটা ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন (NCTE)-এর অভিমত। প্রশিক্ষণ নেই বিহারে এমন শিক্ষকের সংখ্যা ১.৮৬ লক্ষ, উত্তরপ্রদেশে ১.৪৬ লক্ষ, ঝাড়খণ্ডে ৭৭ হাজার, ছত্তিশগড়ে ৪৮ হাজার, ওড়িশায় ৪০ হাজার, জম্মু-কাশ্মীরে ৩১ হাজার, অসমে ১৬ হাজার, মেঘালয়ে ১৪ হাজার, অরুণাচলে ৯ হাজার, মিজোরামে ৬ হাজার ও ত্রিপুরায় ১০ হাজার।

রাজ্যগুলি অবশ্য পরিকাঠামো ও শিক্ষক ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় করছে। সেজন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যবধানের অনুপাত কমানোর জন্য ১৩টি রাজ্যের জন্য সময়সীমা ২০১৫ পর্যন্ত অর্থাৎ আরও দু'বছর বাড়িয়ে দিয়েছে।

সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অব এডুকেশন'-এর তথ্যের ভিত্তিতে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন' এরকম শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য রাজ্যওয়াড়ি মঞ্জুর করেছে এমন পদের সংখ্যা— অরুণাচলে ৮, ৯৪৮, মধ্যপ্রদেশে ৩৪৯০২, ঝাড়খণ্ডে ১৫৯৬৭, বিহারে ৩৯২১০, ছত্তিশগড়ে ৪৫২২৫, মেঘালয়ে ৭৪২২, মণিপুরে ৬৫৮৩, নাগাল্যান্ডে ১০,৮৬৩, ওড়িশায় ৩০০৬৭, পশ্চিমবঙ্গে ১,১৫,০৫০, উত্তরাখণ্ডে ২৩৭৪, উত্তরপ্রদেশে ১, ২৪,০০০ এবং অসমে ৬৮৭২৭ জন।

ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত :

সঠিক ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের হিসাব মাত্র ৬৯ শতাংশ স্কুল দিয়েছে। বিহারে মাত্র ১৪.৮ শতাংশ, দাদরা ও নগর হাভেলিতে ৩০.৯০ শতাংশ, ঝাড়খণ্ডে ৩৫ শতাংশ, ইউপিতে ৩৮.৫৫ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৪২ এবং অরুণাচলে ১৩ শতাংশ এটা করতে পেরেছে।

অন্য পরিকাঠামো যেগুলি স্কুল ব্যবস্থা করতে পেরেছে, যেমন, ছাত্রদের জন্য পানীয় জলের সুবিধা ৯৪.২৬ শতাংশ, সকলের জন্য যোগ্য শৌচাগার ২২ শতাংশ, ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা শৌচাগার ৬৮.৪ শতাংশ। মাত্র ৬১ শতাংশ র‍্যাম্প ব্যবহারে ছেলে-মেয়েরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

কারা কোথায় দাঁড়িয়ে :

শর্তানুযায়ী প্রাথমিক স্তরে ২০০ কর্মদিবস ও ৮০০ ঘণ্টা এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ২২০ দিন ও ১০০০ ঘণ্টার কীভাবে উপযোগ করেছে অধিকাংশ রাজ্য তার হিসাব দিয়েছে। গোয়া ২১০ কর্মদিবস ও ৯২৫ ঘণ্টা প্রাথমিক স্তরে, মেঘালয় ও মিজোরাম ৬০০ ঘণ্টা প্রত্যেক স্তরে কার্যকর করেছে। যদিও রাজস্থান এখন পর্যন্ত এই প্রত্যাশায় সন্তোষজনক উন্নতি দেখাতে পারেনি।

সমস্ত রাজ্যে শিক্ষা অধিকর্তারা কিছু নিয়ম নির্দিষ্ট করেছিলেন— ২৬টি রাজ্য 'স্টেট কাউন্সিল ফর প্রটেকশন অব চাইল্ড রাইটস্' প্রণয়ন করেছে, ১৯টি নবীকরণ করেছে। আর অসম, হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব সেই নিয়মগুলি কার্যকর করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রেরণাসিন্ধু ডাঃ হেডগেওয়ার

সুকেশ মণ্ডল

রাষ্ট্রের বাস্তব ভিত্তি হলো স্বাভিমানী মানুষদের সমষ্টিগত ও সুসংগঠিত জীবন। সমষ্টিগত চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ মহাপুরুষগণ যখন রাষ্ট্রের উপর বিপত্তি নেমে আসে তখন তাঁদের কর্মের দ্বারা জাতি ও রাষ্ট্রের উত্তরণ ঘটিয়ে সমাজ-জীবনে সুস্থিতি প্রদান করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্থাপক প্রাতঃস্মরণীয় ডা. কেশববলিরাম হেডগেওয়ার এই ভিত্তিকে ভালভাবে, সুদৃঢ় ও সূত্রবদ্ধ করে তোলার কাজ করেছেন।

সঙ্ঘবৃক্ষের বীজ ডাক্তারজী। তাঁর কর্মঠ, পরিশ্রমী ও কষ্টময় জীবন দেখে সাধারণ মানুষ একটি দিশা লাভ করে। বড়দের উপেক্ষা, দারিদ্র্য, পরিস্থিতির প্রতিকূলতা, নিরন্তর বাধা-বিরোধ সত্ত্বেও স্বীয় ধ্যেয়ের পূর্তির জন্য তন্ময়তা সহকারে, কোনও চিন্তা না করে যদি প্রচেষ্টারত থাকা যায়, তাহলে সাফল্য অবধারিত। তাঁর প্রথম জীবনীলেখক একটি সুভাষিতম্ দিয়ে শুরু করেছিলেন যা একমাত্র তাঁর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ--- ''বিজেতব্যা লঙ্কা চরণতরণীয়ো জলনিধিঃ / বিপক্ষঃ পৌলস্ত্যো রণভূমি সহায়স্য কপয়ঃ। তথাপ্যেকো রামঃ সকলমবধীদ রাক্ষসকুলম্ / ক্রিয়া সিদ্ধি সত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে।।'' উপকরণহীন অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্র যেমন আপন চরিত্রবলে সমস্ত উপকরণ লাভে সমর্থ হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে ধ্বংস করেছিলেন, তদ্রূপ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতাও নিজ কার্যের সঙ্গে তন্ময় হয়ে ধ্যেয়নিষ্ঠার দ্বারা যুবমানসে বিজিগীষু বৃত্তির স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। এহেন শুদ্ধ জীবন কর্মপ্রেরণার একটি উৎসস্বরূপ।

তাঁর জীবনের প্রধান গুণ হলো জাতীয়মুক্তি ও জাতির উন্নতির জন্য আগ্রহ। তিনি জন্মজাত ধ্যেয়বাদী ছিলেন। কোনও ঘটনার প্রভাবে বা প্রতিক্রিয়ায় তা জাগ্রত হয়নি। এ কারণেই নিতান্ত বালক বয়সে কোনও না কোনও ভাবে ইংরেজ শাসনের মূলোৎপাটন করা প্রয়োজন— এই ইচ্ছা তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছিল। হৃদয়ে নির্ভীক ভাবের জন্য তিনি স্বভাবতই বিপ্লবী কর্মপন্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পড়াশোনার জন্য কলকাতায় আগমন সেই কর্মপন্থারই অনুষঙ্গরূপ।

জন্মজাত দেশভক্ত হওয়ার জন্যই যুবক ডাক্তারজীর প্রিয় লক্ষ্য ছিল বিপ্লবী কর্মপন্থা। কিন্তু হৃদয়ে দেশপ্রেম থাকার জন্য অত্যাচারী বিদেশী শত্রু হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করাই তাঁর মনে প্রধান স্থান পায়নি। বরং তাঁর মনে কতকগুলি জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হয়েছিল— এই রাষ্ট্র কেমন? তার প্রকৃতিই বা কী? বৈভবশালী এই রাষ্ট্রের কেন পতন ঘটলো? তার উন্নত প্রাচীন ঐতিহ্য ও বর্তমান অবনতি কাদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে? ইত্যাদি। গভীর চিন্তন ও মননের ফলে তিনি উপলব্ধি করলেন— আমাদের পুণ্যভূমির জাতীয় জীবন--- হিন্দু জীবন। হিন্দুত্বই জাতীয় জীবনের মূলাধার। তার অবক্ষয়ের ফলেই আমরা অধঃপতিত। এই হিন্দুরাষ্ট্র অতীতে ছিল এবং হিন্দুদের শক্তিতেই ভবিষ্যতেও তার বৈভবপূর্ণরূপ বজায় রাখতে হবে।

হিন্দুরাষ্ট্রের পরমবৈভবশালীরূপ দর্শনের জন্য তিনি সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে সহজভাবে গ্রহণ করেছিলেন। বংশানুক্রমে প্রাপ্ত নিজের উগ্রস্বভাবকে শুদ্ধ করে নিয়ে ধ্যেয়ের সাকার মূর্তি— 'অমূর্ত ধ্যেয় মূর্তরূপ ধারণ' এবং হিন্দুসমাজে ব্যাপ্ত হীন ভাবনা দূর করা ও সর্বস্ব সমর্পণ করার ভাবনা— আমাদের নিজ জীবনকে শুদ্ধ ও মঙ্গলময় করার প্রেরণা ও আত্মবিশ্বাস প্রদান করে। ধর্ম ও সমাজে আগত বিকৃতিগুলির মূলোৎপাটন করে সমাজে যিনি নতুন ব্যবস্থা দাঁড় করান তিনি নিঃসন্দেহে যুগপ্রবর্তক। অসংগঠিত হিন্দুসমাজকে সংগঠিত ও গৌরবান্বিত করার মহান কাজের জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিটি ব্যক্তিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সংস্কার প্রদান করে তাদের এক সংগঠিত, সূত্রবদ্ধ ও অনুশাসিত শক্তির অঙ্গরূপে নিজ ব্যক্তিত্বকে রাষ্ট্রের মধ্যে বিলীন করে সঙ্ঘবদ্ধ ও অনুশাসিত জীবন নির্মাণ প্রক্রিয়ার নাম শাখা পদ্ধতি। এর দ্বারা শুধু রাষ্ট্রীয় ভাবনা ও রাষ্ট্র সমর্পিত জীবনের সংস্কার হৃদয়ে অনুভূত ও সুদৃঢ় হয়।

সমাজকে বৈভবশালী করার জন্য শাখা পদ্ধতিকে তিনি মাধ্যম করেছেন। সংস্কার দানের অভিনব পদ্ধতিতে শাখার বর্তমান কর্মকৌশলের প্রবর্তন হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'রাষ্ট্র দেবোভব' মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে দৈনিক সংস্কার দানের কাজ শাখায় চলে।

তিনি কখনও নিরাশ হননি। জীবনভর আশাবাদী থেকে সক্রিয় থেকেছেন। ১৯৪০ সালে নাগপুর সঙ্ঘশিক্ষাবর্গে সারাদেশ থেকে আগত শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকদের বললেন— ''আমি হিন্দু রাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ

দেখতে পাচ্ছি।”

স্বয়ংসেবক শব্দের নতুন অর্থ প্রদান করেছেন। “আমি ও রাষ্ট্র এক, এহেন ভাবনা নিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রাষ্ট্রকার্যে যাঁরা নিয়োজিত থাকেন তাঁরাই হলেন স্বয়ংসেবক।” স্বয়ংসেবক স্বেচ্ছাসেবক (ভলেন্টিয়ার) নয়। ভগিনী নিবেদিতা ‘রাষ্ট্রীয় মানব’ (National Man)-র যে কল্পনা করেছিলেন ডাক্তারজী তাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট সঙ্ঘ ‘এক পরিবার’ ভাবনায় অবস্থাপিত। ভিন্ন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির লোকেরা একসঙ্গে এক ভাবনায় রাষ্ট্রোত্থানের জন্য কার্যরত থাকেন। সমাজকে এক বিশাল পরিবাররূপে দেখার সংস্কার দেওয়া হয় যেন পরিবারের প্রত্যেক সদস্য অন্য সদস্যদের সুখ-দুঃখকে নিজের বলে মনে করে। নাগপুরের তপ্ত দুপুরে পায়ে হেঁটে শহরের অন্য প্রান্তে স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া তাঁর হৃদয়ে তাঁদের প্রতি গভীর আত্মীয়তার ভাবই বিদ্যমান। তাঁর নিজের ভাষায়— “হৃদয় আত্মীয়তায় পরিপূর্ণ থাকলে কোনও দূরই দূর নয়।”

ব্যক্তিনিষ্ঠা নয়; তিনি তত্ত্বনিষ্ঠা উৎপন্ন করেছেন। তাঁর দেহাবসানের পর দু'জন বালক স্বয়ংসেবকের বার্তালাপ— “যতক্ষণ নতুন সরসঙ্ঘচালকের ঘোষণা না হয়, ততক্ষণ তো আমাদের সামনে পবিত্র গৈরিকধ্বজ আছেই।” ব্যক্তিজীবন সমষ্টিজীবনে বিলীন করে দেওয়ার জ্বলন্ত উদাহরণ তিনি স্থাপন করেছেন। ১৯২৯ সালে ৯, ১০ নভেম্বর নাগপুরে চিন্তন বৈঠকে সঙ্ঘচালকগণ তাঁকে ‘সরসঙ্ঘচালক’ ঘোষণা করেন ও প্রণাম জানান। ডাক্তারজী সেদিন অতি বিনয়ের সঙ্গে জানিয়েছিলেন— “আমি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা নই, আপনারা সবাই। আপনাদের দ্বারা সৃষ্ট সঙ্ঘের, আপনাদের ইচ্ছা ও আজ্ঞায়, আমি ধাত্রীর কাজ করছি। আপনাদের আদেশে যত আনন্দের সঙ্গে আমি এই পদ স্বীকার করেছি, ততটাই আনন্দের সঙ্গে আপনাদের দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তির হাতে সমস্ত অধিকার সমর্পণ করে সেই মুহূর্ত থেকেই তার আজ্ঞাবহ স্বয়ংসেবক হিসাবে কাজ করে যাব।” নেতৃত্বের রত্নখচিত সিংহাসনটিকে নিজের বলে মনে না করে পরম কর্তব্যজ্ঞানে সমস্ত কার্যের ভার বহন করার মতো মানসিক অবস্থা এবং সর্বোপরি হিন্দু-রাষ্ট্রপুরুষের একনিষ্ঠ সেবকরূপে ডাক্তারজী চিরভাস্বর। সঙ্ঘের অনুশাসনপূর্ণ বিকাশের রহস্য যে এই গঠনতন্ত্রের মধ্যে নিহিত— সময় একথা প্রমাণ করেছে। নতুন প্রজন্মকে হাতে নিয়ে তাদের হিন্দুরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত করে ভাবী ইতিহাস নির্মাণের পুরোধাপুরুষ তিনি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ অবিরাম বলবান হয়ে উঠছে— দিকে দিকে নবযুবকের দল উদ্দীপনাময় উৎসাহের সঙ্গে বৈভবময় ভারত গঠনে সংকল্প গ্রহণ করছে এবং সেই কারণেই বৈভবকাল ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে— এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সার্বজনীন ক্ষেত্রে আজ চরিত্রের যে উদাসীনতা, উপেক্ষা ও অবক্ষয় শুরু হয়েছে সেই পটভূমিতে প্রখর পবিত্রতার তেজে ডাক্তারজীর জীবন উদ্ভাসিত আমাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে নিজ জীবনকে পবিত্র ও মঙ্গলময় করে তোলার প্রেরণা ও বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। সমাজে আজ যখন নীতিশূন্য, চরিত্রশূন্য ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছে, তখন তার বিপরীত কাজ করে কোন্‌টি সঠিক তার উদাহরণ তিনি রেখে গেছেন। এহেন মহান চরিত্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট প্রেরণার উৎসস্থল।

ডাঃ হেডগেওয়ারের জন্মতিথি (বর্ষ প্রতিপদ ১১ এপ্রিল) উপলক্ষে প্রকাশিত।

M - 9933967518 | ভারত সরকার দ্বারা অনুমোদিত | M - 9933967518

সৃষ্টি কম্পিউটার স্বাক্ষরতা মিশন TM

An ISO 9001 : 2008 Certified Organization

Computer Courses	Distance Courses
Basic , Internet D.T.P. Hardware,Multimedia, FA,Teacher Tranning Mobile Reparing	BA, MA, B.Com, M.Com, B.Sc. , M.Sc., BSW, MSW,B.Lis, M.Lis,BCA, MCA,BSc.-IT, MSc.-IT,BBA, MBA

City Office : Garia,Srinagar Main Road, Kol-700094

Regd. Office : Vill+P.O.- Kashinagar, P.S.- Raidighi, Pin-743349

SCSM –এর অনুমোদিত কম্পিউটার সেন্টার খোলার সুবর্ণ সুযোগ।

Want : New Franchise , Agent ,Officer ■ Website: WWW.SCSM.CO.IN

অন্য রকম

শিক্ষা প্রসারে হিপোক্যাম্পাস

বিরাজ রায়॥ মেধার বিকাশে দরকার উপযুক্ত পরিবেশ, আর এই পরিবেশও সুযোগ থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত থেকে যায় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা। এরকমই গ্রামাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া শিশুদের পাশে দাঁড়িয়েছে কর্ণাটকের 'হিপোক্যাম্পাস লার্নিং সেন্টার।' খুব কম খরচে ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে স্কুলের আগে পড়তে পারছে। সংস্থাটি কয়েক বছর ধরে এই কাজ করে চলেছে। কর্ণাটকে তাদের এরকম সাতাত্তরটি স্কুল আছে। আগামী দু'মাসে শুরু করা হবে আরও চল্লিশটি। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা উমেশ মালহোত্রা জানিয়েছেন— 'ব্যবসায়িক দিকটি না দেখে শুধুমাত্র গ্রামীণ সমাজের কথা ভেবেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।' তাদের এই কাজে উপকৃত হয়ে খুশি গ্রামের সাধারণ পরিবারগুলিও।

আই আই টি-র প্রাক্তন ছাত্র উমেশ মালহোত্রা ২০১০ সালে এই কাজে প্রথম হাত দেন। বন্ধু-আত্মীয়দের কাছ থেকে দু-কোটি টাকা সংগ্রহ করে সংস্থাটি চালু করেন। এর আগে একটি এন জি ও-র সাহায্যে তিনি লাইব্রেরিও শুরু করেন। তারও নাম হিপোক্যাম্পাস। বর্তমান তাদের এই লার্নিং সেন্টারে আড়াইশো জন শিক্ষক রয়েছেন। পড়াশুনা করছে প্রায় তিন হাজার ছাত্র। যারা এখানে পড়ছে তাদেরকে বার্ষিক দু-তিন হাজার টাকা ফী দিতে হয়। কর্ণাটকের মান্দ্যা ও চিত্রদুর্গ জেলার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে এই স্কুলগুলি।

'হিপোক্যাম্পাস লার্নিং সেন্টারে'র এমনই একটি স্কুল আছে কাথানাহাল্লিতে, ব্যাঙ্গালোর থেকে ১১০ কিলোমিটার দূরের প্রত্যন্ত একটি গ্রাম। তারই ছাত্র তিন বছর বয়সি লিখিথ গৌড়া, মাথা দুলিয়ে ইংরাজী স্পষ্ট উচ্চারণে বলে যাচ্ছে— মাই নেম ইজ লিখিথ গৌড়া, আই অ্যাম এ বয়, আই লিভ ইন কাথানাহাল্লি। ওখানে একটি গোরুর খাটালে তাদের স্কুল। দেয়ালে ঝোলানো ব্ল্যাকবোর্ড, নম্বর দিয়ে সাজানো বিভিন্ন রকমের ফুল ও ফলের ছবি। যদিও সেই ঘরে ওগুলো বেমানান। স্কুলটিতে ছত্রিশ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে। গ্রামের সাধারণ কৃষক, তুলো ব্যবসায়ী এরকমই নিম্নবিত্ত পরিবার থেকেই অধিকাংশরা পড়তে আসে। পরিবারে প্রথম ইংরাজী পড়ছে এরকম ছাত্র যেমন রয়েছে তেমনি প্রথম স্কুলে আসছে এরকমও আছে। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে স্থানীয় তুলো ফার্মের শ্রমিক কৃষ্ণকুমার জানিয়েছে— 'আমরা তো পড়াশুনা করতে পারিনি, কিন্তু আমরা চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করুক।'

হিপোক্যাম্পাসের এই স্কুলগুলিতে প্রথামাফিক পড়াশুনার পাশাপাশি ছোটোদের ইংরাজীতে লেখা, কথা বলা ও পরিবেশ সম্পর্কেও সচেতন করা হচ্ছে। খাওয়ার আগে হাত ধোয়া, ভালো ব্যবহার করা— এগুলোও নিয়মিত শেখানো হয়। মালহোত্রা জানিয়েছেন, 'ছোটোদের উচ্চশিক্ষিত করার জন্য অভিভাবকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাদের যাতে সৃজনশীলতার বিকাশ হয় হিপোক্যাম্পাস সেদিকেও নজর রাখছে।'

রাম ও রামায়ণের সর্বশেষ সামগ্রিক
ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা
বিমান বিহারী রায়ের

রামায়ণ যখন ইতিহাস

মূল্য ঃ ১২০.০০ টাকা

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

তুহিনা প্রকাশনী

১২সি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩
মোবাইল ঃ ৯৭৩৩৫৭৭৪৩৪

BSNL কর্মচারীদের এক এবং দুই-
তাদের সঙ্গে নানান সময় যুক্ত হওয়া সই।
BSNL-এর সর্বনাশের এই তিনটি পাণ্ডা-
এদের বিরুদ্ধে ধরতে হবে লড়াইয়ের ঝাণ্ডা।
OT, মেডিকেল, LTC সব হারিয়ে তাই-
নতুন প্রভাত আনব বলে বুক বেঁধেছি ভাই।
ভারত মাতার শপথ নিয়ে এবার ভোটে তাই-
শিল্প বাঁচাতে মোদের এবার **BTEU** -কে চাই।
এপ্রিলের ১৬ তারিখে ৩-এ দিয়ে ছাপ্পা-
ভবিষ্যতে পেনশন করব মোরা রক্ষা।

Affiliated to :

BHARATIYA MAZDOOR SANGH

সভাপতি/ **BTEU BSNL**
শ্রী মানবেন্দ্র সাহা
৯৪৩৩৩১৪১৩৬

সম্পাদক/ **BTEU BSNL**
শ্রী কে কে মিত্র
৯৪৭৭৩২২৪৫৫

পুস্তক প্রসঙ্গ

পরস্পরের প্রয়োজনে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ইতিবাচক উত্তরণ ঘটছে

বিজয় আঢ্য

বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক নিয়ে নতুন সম্ভাবনার দিকে আলোকপাত করেছেন বাংলাদেশেরই কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত বিদ্বজ্জন। আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে সম্পাদিত একটি গ্রন্থে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের এই মতামত ভেবে দেখার মতো। ভৌগোলিক অবস্থান, আকারগত বৈষম্য এবং 'ঐতিহাসিক অবিশ্বাস' যে দু' দেশের সম্পর্ককে সহজ হতে দেয়নি, এ নিয়ে সবাই কমবেশি একমত। 'সম্পর্কের হালচাল' নিবন্ধে শিক্ষাবিদ হায়াৎ মামুদ লিখেছেন— ''বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কটি বড়ো অদ্ভুত। সীমান্তের চেকপোস্টগুলোর খোঁজ নিলেই জানা যাবে, প্রত্যহ কী সংখ্যক বাংলাদেশী নাগরিক ভারতে যাচ্ছেন। বেড়াতে নয়, প্রয়োজনের গরজে। প্রথম তাগিদটা হলো— চিকিৎসার।... এখানে আসার তাগিদ ভারতীয়দের ততোখানি নেই, যতোখানি সেখানে যাওয়ার গরজ আমাদের রয়েছে।''

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের ভিত্তিটা যেহেতু দ্বিজাতিতত্ত্ব, সেই কারণে প্রথম থেকে পাকিস্তানের ভারত-বিরোধিতা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু যে ভারত অস্ত্র দিয়ে, প্রশিক্ষণ দিয়ে, দু' লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে এবং তাদের হাজার হাজার সৈনিকের রক্ত দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে, সেই ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের এতটা বৈরী সম্পর্ক হয়ে উঠবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। বইটির সম্পাদক সাংবাদিক অসীম সাহা-র বক্তব্য— ''প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই। ক্ষমতালিপ্সু খন্দকর মোশতাক আমেদ, তাহের ঠাকুরসহ আরও অনেকেই ভারতে বসেই মুক্তিযুদ্ধকে ব্যর্থ করে দিতে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশনের চক্রান্তে মিলিত হয়েছিল।'' এবং তাঁর আরও বক্তব্য--- ''এটা বাস্তব, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অমীমাংসিত সবগুলো সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধানও যদি হয়ে যায়, তাহলেও এইসব মৌলবাদী দল (বি এন পি, জামাত ইত্যাদি) ভারত বিরোধিতা থেকে যে একটুও সরবে না, এটা নিশ্চিত করেই বলা চলে।'' তবে এই সূত্রে এটাও মনে রাখতে হবে, ইতিহাস তার আপন শক্তিতেই সত্য আবিষ্কার করে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হবার শক্তি রাখে। ১৯৯০ সালের সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী সফল গণ- আন্দোলনের পর থেকে বাংলাদেশের নবীন প্রজন্মের মনোজগতে যে বিকাশ ঘটে, তার পরিণতি পায় ২০০৯ সালে, যখন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট বিপুল

সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসে। সাধারণ মানুষও বোঝে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব নয়। দু' দেশের ভৌগোলিক অবস্থানই জানিয়ে দেয়, একসঙ্গে কাজ করা ছাড়া তাদের কোনও বিকল্প নেই। দু' দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে আলোচনাই একমাত্র সঠিক পথ। আর তখন থেকেই নতুন মাত্রা যোগ হয় ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কে। সাম্প্রতিক শাহবাগ আন্দোলন তারই বিস্তার।

এই বোধেই উদ্দীপ্ত বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। 'বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী : বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা' নিবন্ধে উঠে এসেছে এই বোধের কথা— ''দেশ আলাদা হলেও আমরা সবাই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও বিশ্ব মানবসভ্যতার সমউত্তরাধিকারী।...বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অত্যন্ত জরুরি। ...অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের যতো না প্রয়োজন বাংলাদেশকে— বাংলাদেশের বেশি প্রয়োজন ভারতকে এবং এটা হচ্ছে এক কঠিন বাস্তবতা।''

২০১০ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর এবং সেই সূত্রে দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত ৫টি চুক্তি—যার মূল কথাই হলো যোগাযোগ বা Connectivity। এতো ব্যাপক পরিসরের সমঝোতা আগে দু' দেশের মধ্যে হয়নি। ভারত বাংলাদেশকে ১০০ কোটি টাকা (১ বিলিয়ন ডলার/ ৪৫০০ কোটি বাংলাদেশী রূপি) ঋণ দেবে। এর আগে ভারত আর কোনও দেশকে এককালীন এই পরিমাণ ঋণ দেয়নি। কিন্তু ঘটনা হলো, ইতিমধ্যে তিন বছর পার হয়ে গিয়েছে। যাঁরা আশা করেছিলেন বাংলাদেশ- ভারত যৌথভাবে অনেকটা পথ পাড়ি দেবে তাঁরা আশাহত হয়ে পড়েছেন।

এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় বাধা— কথাশিল্পী সাংবাদিক আবদুল গাফফার-এর কথায়--- ''ব্যুরোক্র্যাসির (বাংলাদেশ) একটা বড় অংশ ভারত-বিরোধী মনোভাব ছড়ানোর চক্রান্তে লিপ্ত এবং সরকারের বাইরে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গেও তাঁরা গোপনে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন।'' (ইতিহাসের রক্ত পলাশ পনেরোই আগস্ট পঁচাত্তর— পৃষ্ঠা ৮১)। গ্রন্থটির অন্যতম সম্পাদক সাংবাদিক বাসুদেব ধর-এরও রচনায় এই উদ্বেগ ধরা পড়েছে— ''দু' দেশের সম্পর্কের নতুন মাত্রায় শংকিত কায়েমি স্বার্থান্বেষীরা।'' তবে সাংবাদিক খন্দকার মনীরুজ্জামান এতসবের পরেও যে আশার কথা শুনিয়েছেন--- 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার চারদশক পর বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধীরে হলেও ইতিবাচক উত্তরণ ঘটছে'— তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে বোধ হয় দ্বিধা হওয়া উচিত নয়।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। সম্পাদনা : অসীম সাহা ও বাসুদেব ধর। প্রকাশক : আগন্তুক, ৮, নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫। মূল্য : ১২০.০০ টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশত সমারোহ সমিতির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বামীজী দেশের সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছিলেন। তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে নতুন ভারত গড়ে উঠবে চাষী, ভুনাওয়ালা, মুচি, মেথর সবাইকে নিয়ে। আজও ভারতের ৮৪ কোটি মানুষ গ্রামবাসী; দেশের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ। তাই দেশের প্রত্যেক জেলায় ২টি করে অন্তত 'আদর্শ গ্রাম' (মডেল ভিলেজ) যদি গড়ে

মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) অরুণপ্রকাশজী, মুরালভাই, স্বামী ভবেশানন্দ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও অরবিন্দ দাশ।

তুলতে পারি, তবে কিছুটা হলেও স্বামীজীকে শ্রদ্ধা জানানো হবে। গত ৩১ মার্চ বিকেলে কলকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটিতে আয়োজিত এক সভায় এই বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী তথা বেলুড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বামী ভবেশানন্দ। স্বামীজীর জন্মসার্ধশত সমারোহ-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমিতি আয়োজিত এই প্রথম বৈঠকে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ মন্দিরের ব্রহ্মচারী মুরালভাই, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অসম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুভাষ সাহা, সমিতির মুখ্য সংযোজক কিশোর টকেকর, দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দিরের ট্রাস্টি কুশল চৌধুরী, সমিতির সম্পাদক সুকমল চন্দ্র বসু, আর এস এসের অখিল ভারতীয় সহ-সম্পর্ক প্রমুখ অরুণ কুমার, সাংবাদিক অসীম কুমার মিত্র, সমাজসেবী রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক। প্রদীপ প্রজ্বলন ও শিবপূজন সিং-এর শান্তিমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়।

ওইদিন সভায় বক্তারা স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বর্তমানে তার প্রাসঙ্গিকতার আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সমিতির ১৩০ জন সদস্যের নাম এই দিন ঘোষণা করা হয় এবং সেইসঙ্গে উপস্থিত সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এযাবৎ সমিতির পক্ষ থেকে কি করা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণেশ্বর মন্দির পরিসরে প্রদেশ সম্বর্ধিনী (মহিলা) সম্মেলন (১৫ সেপ্টেম্বর) এবং ২০১৪ জানুয়ারিতে বিশাল যুব সম্মেলন হবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রান্ত সম্পাদক অরবিন্দ দাশ এবং ধন্যবাদ জানান সহ-সম্পাদক অমরকৃষ্ণ ভদ্র।

অধিবক্তা পরিষদের সর্ব ভারতীয় কমিটি

অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি শিলচরের বিশিষ্ট আইনজীবী শান্তনু নায়েককে অধিবক্তা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রীয় সম্পাদক (Zonal Secretary) হিসাবে নিযুক্তি করা হলো। গত ২৭, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বরে (২০১২) ভুবনেশ্বরে অধিবক্তা পরিষদের কেন্দ্রীয় অধিবেশনে বলরাজ মহাজনকে সভাপতি, ডি. ভরত কুমার সাধারণ সম্পাদক এবং চুনিলাল অরোরাকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয় এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি গঠন করার দায়িত্ব তাদের উপর দেওয়া হয়। পরে শ্রী বলদেব মহাজন তার ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট সর্বভারতীয় কমিটি আগামী দুই বৎসরের জন্য গঠন করেন।

ধর্মসম্মেলন ও লালন মেলা

পুরুলিয়া জেলার বরাবাজার থানার পুইজাঙ্গা (খুড়াড়ি) গ্রামে গত ১১, ১২ ও ১৩ মার্চ তিনদিন ব্যাপী ধর্মসম্মেলন ও বাংলার বিশিষ্ট বাউল শিল্পীদের নিয়ে 'লালন মেলা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানবক্তা দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ধর্মজাগরণ প্রমুখ সনাতন মাহাতো বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দু ধর্মের মানব কল্যাণকারী সংস্কৃতির বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবানন্দ মহারাজ। 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' হিন্দু তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়টি তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

পারিবারিক বনভোজন

গত ১৭ মার্চ মালদা জেলার কালিয়াচক মহকুমার সঙ্ঘ পরিবারের এক বনভোজনের কার্যক্রম হয়ে গেল ফরাক্কার গঙ্গার ধারে। সবমিলিয়ে ১০০ জন কার্যকর্তা ও তাদের সহধর্মিণীরা ছেলেমেয়ে নিয়ে এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। খাওয়ার আগে এবং পরে দুটি বৈঠকে পরিচয়, গীত, প্রশ্নোত্তর এবং সঙ্ঘের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন নন্দন ঘোষ, অখিল ঋষি, রাজু কর্মকার, মলয় দত্ত এবং তরুণ কুমার পণ্ডিত। কার্যক্রমের শেষে সবাইকে ভারতমাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি দেওয়া হয়।

সমাজ সেবা ভারতীর স্মরণিকা 'সেবা চেতনা'র লোকার্পণ

সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক স্মরণিকা 'সেবা চেতনা' ২০১৩-র শুভ উন্মোচন হলো গত ৩১ মার্চ। কলকাতার কেশব ভবনে আয়োজিত সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের প্রাদেশিক বৈঠকে স্মরণিকাটি উন্মোচন করলেন অখিল ভারতীয় সহ সম্পর্ক প্রমুখ অরুণ কুমারজী।

সমাজ সেবা ভারতী ২০০৪ সাল থেকে এই স্মরণিকা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করে আসছে। এটি তার নবম প্রকাশন। অনেক প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে এই সংখ্যাটি প্রকাশ করা গেল যা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া আর কি-ই বা বলা যাবে। এবারও পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজীর আশীর্বাণী দিয়ে আমাদের স্মরণিকা সমৃদ্ধ হয়েছে। পূর্ব সেবাপ্রমুখ সীতারামজীর পদব্রজে ভারত ভ্রমণ প্রচ্ছদে শোভা পাচ্ছে। তাঁর এই ভারত পরিক্রমা গ্রামীণ ভারত জাগরণের বিশেষ প্রয়াস।

সেবা বিভাগের সহযোগিতায় এই ভারত পরিক্রমা স্বামীজীর স্বপ্নকেই বাস্তবে রূপ দেবে। স্মরণিকাটি সমস্ত সেবাভাবী স্বয়ংসেবক ও সামাজিক কার্যকর্তাদের দরিদ্রনারায়ণের সেবায় অনুপ্রাণিত করলে স্মরণিকা প্রকাশ সার্থক হবে বলে উদ্যোগীরা মনে করেন।

কর্ণমাধবপুরে রক্তদান শিবির

গত ২৪ মার্চ, উত্তর ২৪-পরগণা জেলার কর্ণমাধবপুরে সমাজ সেবা ভারতীর উদ্যোগে রক্তদান শিবির হয়ে গেল। এই শিবিরে স্থানীয় সংস্কৃত পণ্ডিত ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সনৎ কুমার ব্যানার্জী, সমাজ সেবা ভারতী সহ-সম্পাদক শিবদাস বিশ্বাস, বিজেপি-র স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা শ্রীমতী ময়না মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন অমর সিংহ (শানুদা), অসিত চ্যাটার্জি, দেবু মাহাত এবং অসীম মণ্ডল প্রমুখ। মোট ৪০ জন রক্ত দান করেন। এর মধ্যে ১২ জন মহিলা ছিলেন।

শোকসংবাদ

চলে গেলেন অমিয়প্রভা মিত্র। তিনি ছিলেন সঙ্ঘের অনুরাগী তথা উত্তর ২৪-পরগণা বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ মানস কুমার মিত্রর মাতৃদেবী। গত ২০ মার্চ, রাত্রি ১১টা নাগাদ তিনি নিজবাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০১ বছর। পাঁচকন্যা, তিন পুত্র সহ তাঁর নাতি নাতনিরা বর্তমান।

***

কলকাতা দক্ষিণপূর্ব ভাগের নিবেদিতা নগরের স্বয়ংসেবক রাজু দাসের পিতা গণেশ দাস গত ২০ মার্চ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

***

গত ফেব্রুয়ারি মাসে সন্ধ্যা দে মেদিনীপুর শহরে (পাহাড়ীপুর) নিজ বাসভবনে গত হয়েছেন। তাঁর চারপুত্র স্বয়ংসেবক। প্রসঙ্গত বাঁকুড়া বিভাগ সঙ্ঘচালক অসিত দে-র তিনি বড় বৌদি।

***

সঙ্ঘের মালদা জেলার গৌড়খণ্ডের পার্বত্যা শাখার কার্যবাহ পবন ঘোষের মা গত ১২ মার্চ দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

গত ৩১ মার্চ কলকাতায় জয়সওয়াল ভবনে রাজস্থান পরিষদের উদ্যোগে রাজস্থান দিবস ও স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতজন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকেন্দ্রিক স্মরণিকার লোকার্পণ হয়। ছবিতে মঞ্চে রয়েছেন বাঁদিক থেকে রুগলাল সুরানা জৈন, পরশুরাম মুন্দ্রা, অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, বিজয় গুজরওয়াসিয়া, বেণুগোপাল বাঙ্গর, নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য, শান্তিলাল জৈন, নন্দলাল শাহ, যুগলকিশোর জৈথলিয়া ও মোহনলাল পারীক প্রমুখ।

যে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতের কথা প্রথম রেকর্ড হয়

অরবিন্দ ঘোষ

ছোটবেলায় শহর থেকে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আমরা নিজেদের বাগান থেকে আম জাম ইত্যাদি, নিজেদের পুকুর থেকে ধরা রুই কাতলা মাছ খাওয়া ছাড়া অন্য একটি আকর্ষণ ছিল 'কলের গান' শোনা। আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না কী করে ওই কাঠের বাক্স থেকে মানুষের আওয়াজ আসে। পরে জানলাম ওই যন্ত্রকে বলা হয় গ্রামাফোন আর ওই গোল চাকার মতো জিনিসটাকে রেকর্ড বলা হয়।

বড় হয়ে স্কুল কলেজ থেকে ওই কলের গানের রহস্যটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু প্রথমবার কোন ব্যক্তির দ্বারা উচ্চারিত শব্দ বা গান রেকর্ড করা হয়, আর কোন কথা বা সঙ্গীতটি আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক রেকর্ড করেন তা জানা ছিল না।

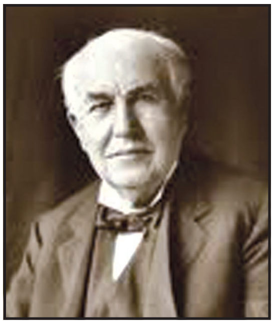

এডিশন

ম্যাক্সমুলার

জানতাম যে বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক Thomas Alva Edison যিনি ইলেক্‌ট্রিক বাল্ব প্রভৃতি আবিষ্কার করেছিলেন, তিনিই গ্রামাফোনও আবিষ্কার করেছিলেন। জানতাম না কে বা কার দ্বারা উচ্চারিত শব্দ বা বাক্য তিনি রেকর্ড করেছিলেন।

পরে জানতে পারলাম Thomas Alva Edison স্থির করেন যে বিশ্ববিখ্যাত মনীষী Max Muller (ম্যাক্‌স মুলার)-এর স্বর প্রথমবার রেকর্ড করবেন। তিনি জার্মানীতে মুলার সাহেবকে লিখেছিলেন যে নিজের দ্বারা আবিষ্কৃত মেশিনে তাঁর কথা রেকর্ড করতে চান।

মুলার সাহেব জার্মানী থেকে জানালেন যে দু'মাস পরে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি লন্ডনে একত্রিত হবেন, তিনিও যাবেন, আর এডিসন যেন তখন ওখানে আসেন, সেখানেই রেকর্ডিং করা যাবে। এডিসন তখন জাহাজে করে লন্ডনে পৌঁছান। সেখানে এডিসন সাহেব ম্যক্‌স্ মুলার সাহেব দ্বারা উচ্চারিত একটি বাক্য রেকর্ড করেন ও তিন চার ঘণ্টা পরে রেকর্ড বাজিয়ে ওই বাক্যটি সকলকে শোনান। এডিসন মানবস্বর (human voice) রেকর্ড করাও আবিষ্কার করেছিলেন।

এরপর উপস্থিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের তিনি জিজ্ঞাসা করেন— তিনি কোন বাক্যটি রেকর্ড করেন? উপস্থিত পণ্ডিতেরা কিছুই বলতে পারলেন না। বাক্যটি ল্যাটিন (Latin) ভাষাতেও নয়।

তখন ম্যাক্‌স মুলার সাহেব জানালেন, তিনি যে বাক্যটি রেকর্ড করার জন্য বলেছেন তা সংস্কৃত ভাষাতে বলা হয় ও হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ Rigveda থেকে বাক্যটি নেওয়া হয়েছিল। "অগ্নি মীলে পুরোহিতম্" ("Agni Meele Purohitam") যা বেদের প্রথম ঋক্। মানব সমাজের দ্বারা লিখিত বা উচ্চারিত প্রথম বাক্য। এর রচনা যখন হয় তখন বিশ্বের অন্যত্র সমাজ সভ্য হয়নি। তারা তখনও শরীর ঢাকবার জন্য কাপড় তৈরি করতেও শেখেনি। সেই সময় ভারতবাসীরাই বিশ্বকে সভ্যতার পাঠ পড়ান।

এই কথা শোনার পর উপস্থিত জ্ঞানী ব্যক্তিরা দাঁড়িয়ে উঠে বেদকে সম্মান জানান। মুলার সাহেব তখন ওই ঋক্‌টির অর্থ জানান—"Oh Agni, you who gleam in the darkness, to you we come day by day, with devotion and bearing homage. So be of easy access to us. Again, as a father to his son, abide with us for over well being."

উপস্থিত পণ্ডিতেরা তখন দাঁড়িয়ে উঠে ঋক্‌বেদকে সম্মান জানান।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) : ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন : ২৪১৫-৩৫৬৬

‘বলিউডের অধিকাংশ সিনেমাই গুরুত্বহীন’ —নাসিরুদ্দিন শাহ

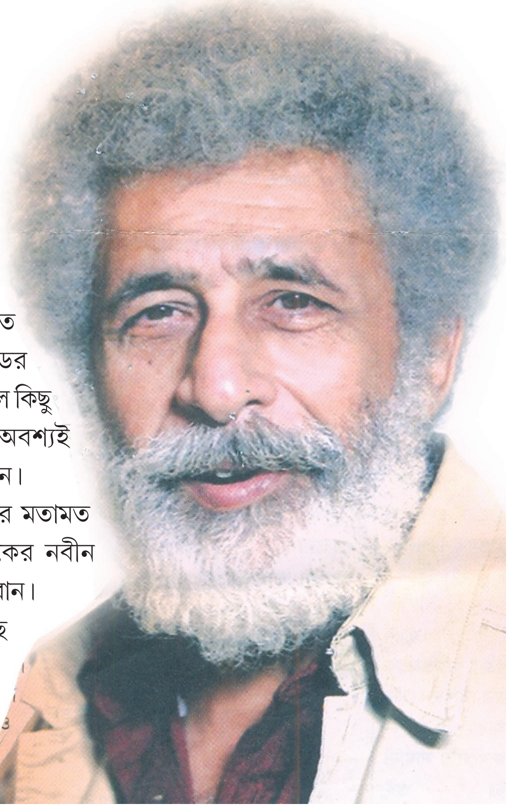

বিকাশ ভট্টাচার্য

‘ভার্সেটাইল অ্যাক্টর’ হিসেবে নাসিরুদ্দিন শাহ শুধুমাত্র হিন্দী ছবির জগতেই নয় হলিউডেও নিজের স্থান করে নিয়েছেন। প্রায় পঞ্চাশবছর হতে চলল, অভিনয়ের জগতে আছেন। হিন্দী, ইংরেজী এমন কি বেশ কিছু বাংলা ছবিতেও অভিনয় করেছেন। এই বিরল প্রতিভার অভিনেতাকে খুঁজে এনেছিলেন অন্যধারার পরিচালক শ্যাম বেনেগাল। অঙ্কুর, নিশান্ত, মন্থন— প্রথম আগমনেই সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য বেশ কিছু বাণিজ্যিক ফরমুলা ছবিতেও তাঁকে দেখা গেছে। কিন্তু সেখানেও তাঁর অভিনয়ের নিজস্বতা থেকে তিনি সরেননি।

ছায়াছবির ব্যস্ততা সত্ত্বেও নাসিরুদ্দিন নাটক নিয়ে দীর্ঘদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচ্ছেন। অভিনেতা-নির্দেশক হিসেবে সেখানেও তিনি নিজের স্বকীয়তাকে ধরে রেখেছেন। এই কলকাতাতেও তিনি বারবার এসেছেন নিজের নাটক নিয়ে। কলকাতার দর্শকদের সম্বন্ধে তিনি বরাবর উচ্ছ্বসিত।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় সিনেমার— যার সিংহভাগ জুড়ে আছে হিন্দী সিনেমা, সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, ‘একটা স্বাস্থ্যকর সমান্তরাল সিনেমার ধারা ভারতে গড়ে উঠেছে। অনেক নির্দেশক তাঁদের নিজেদের ভাষায় তাঁদের সমস্যাগুলোকে তুলে ধরছেন। তবু আমি বলব ভারতীয় সিনেমার সব থেকে বড় সমস্যা ভাল চিত্রনাট্য। ভারতীয় সিনেমা নিয়মিত ভাল চিত্রনাট্য তৈরি করতে পারে না।’ তাঁর মতে বলিউডের অধিকাংশ সিনেমার শিল্পগুণ বলে কিছু নেই। যদিও কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে— এটাও তিনি মনে করেন।

এরপর অভিনয় বিষয়ে তাঁর মতামত তিনি ব্যক্ত করেন। যা আজকের নবীন অভিনেতাদের কাছে বেশ মূল্যবান। তাঁর কথায়, অভিনেতার কাছে প্রস্তুতির এক একটি অংশ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। চরিত্রের ইতিহাস সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যে চরিত্রগুলিকে আমরা দেখি, তার প্রত্যেকটিই নিজের বর্তমান ছাড়াও নিজের অতীতকে— তার ইতিহাসকে বহন করে। সেই চরিত্রটি কোন অবস্থান থেকে এসেছে; ব্যক্তিগত কি কি ইতিহাস সে বহন করছে--- এই কারণগুলি চরিত্র প্রস্তুতিতে শিল্পীর কাছে আলাদা গুরুত্ব পায়। তাঁর মতে, অভিনেতা হলো একজন দূত এবং একজন দূতের উদ্দেশ্য হলো তার বাণীকে মানুষের কাছে অবিকৃত অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া। এই অবিকৃত ও সম্পূর্ণ বাণী এমনভাবে পৌঁছে দিতে হবে যাতে তা দর্শকদের মধ্যে আবেগ তৈরি করতে পারে— তার জন্যে যদি একটা অন্যরকম বাচনভঙ্গির প্রয়োজন হয় বা দাড়ি রাখতে হয় কিংবা পেশীবহুল শরীরের প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা একজন অভিনেতাকে করতে হবে, এটা তার কর্তব্য।

নতুন অভিনেতাদের প্রতি তাঁর পরামর্শ হলো--- অভিনেতাদের মানুষের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা খুব জরুরি। একজন বড় অভিনেতাও সারাজীবন নায়ক থাকতে পারেন না। তখন তাঁকে তাঁর ভেতরের অভিনেতাটি বাঁচিয়ে রাখে। নিজের ভেতরের অভিনেতাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে নিজের সমাজ সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। সময় যেমন বদলায়, অভিনেতাকেও সেভাবে বদলাতে হয়, কারণ একজন অভিনেতা যে চরিত্রই করুক না কেন তাঁকে সংযোগ স্থাপন করতে হয় বর্তমান সময়ের সঙ্গে। শিল্পীর মতে— নাট্যকার, নির্দেশক তথা প্রযোজনার মূল বক্তব্যটা দর্শকদের কাছে অভিনেতা যদি পৌঁছে দিতে পারেন, তাহলে সেটাই তাঁর জয়, বাকি সব কিছুই গৌণ।

সৌজন্য : প্রতি বৃহস্পতিবার নাট্য মুখপত্র।

শব্দরূপ-৬৬৪ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	■	৩		৪
■	■	৫	৬			■	
■	৭	■		■	■	■	
■	৮			■	■	৯	
১০		■	■	১১			■
	■	■	■		■		■
	■	১২			১৩	■	■
১৪			■	■	১৫		

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা, **৩.** রামচন্দ্র কর্তৃক স্বর্ণমৃগের ছদ্মবেশে নিহত রাক্ষস, **৫.** বিশ্বকর্মা-সৃষ্ট অপ্সরা বিশেষ, ‘‘কলকাতা একদিন কল্লোলিনী— হবে’’ **৮.** সূর্য, **৯.** বানররাজ, সুগ্রীবের অগ্রজ, **১০.** ভ্রমর, **১১.** পুরোহিত, **১২.** বৃষ্টির সময় গ্রামের পথঘাট এতে মাখামাখি হয়ে থাকে, **১৪.** চতুর্থ পাণ্ডব, **১৫.** শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা পত্নী, বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা।

উপর-নীচ : **২.** মদনপত্নী, **৩.** মাতুল, **৪.** রাধিকার সখী বিশেষ, জ্যোৎস্না, **৬.** ভূমিতে লুণ্ঠন; পায়রার জাতি বিশেষ, **৭.** ইন্দ্রের সারথি, **৯.** বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত একপ্রকার সাঙ্গীতিক উৎসব, **১০.** যে দিনে রন্ধন নিষিদ্ধ, ভাদ্রসংক্রান্তি, **১১.** প্রাচীন গ্রন্থে অধ্যায় শেষে বিবৃত বিষয়ের উল্লেখ বা ভণিতা, **১২.** এর অপর নাম জীবন, **১৩.** কাষ্ঠ; মদ্য।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৬১
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

অ	সে	চ	ন	ক	■	■	অ
■	বা	■	■	পি	■	■	ন্ত
■	ই	■	■	ল	শ	ক	র
ধা	ত	ব	■	■	হি	■	■
■	■	রু	■	■	দ	ল	মা
শূ	র্প	ণ	খা	■	■	ল	■
দ্র	■	■	স্বা	■	■	স্তি	■
ক	■	■	জ	র	ৎ	কা	রু

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

▯ ৬৬৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ৬ মে, ২০১৩ সংখ্যায়

‘‘হিন্দু দর্শনের মতে আমরা যাহাতে শাস্তি বলি — উহা কোন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। আমরা যদি আগুনে হাত দিই, হাত পুড়িয়া যায়। উহা একটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। জীবনের ভবিষ্যৎ অবস্থা বর্তমান অবস্থা দ্বারা নিরূপিত হয়। হিন্দুরা ঈশ্বরকে শাস্তিদাতা বলিয়া মনে করে না।

মিশনারীরা ভারতে গিয়া শুধু দুইটি কাজ করেন— যথা দেশবাসীর পবিত্রতম বিশ্বাসসমূহের নিন্দা করা এবং জনগণের নীতি ও ধর্মবোধকে শিথিল করিয়া দেওয়া।’’

— স্বামী বিবেকানন্দ
(বাণী ও রচনা, ১০/১৫)

সৌজন্যে : জনৈক শুভানুধ্যায়ী

কেরলের তিরুবনন্তপুরমে স্বামীজীর নামে তিন চিন্তা-ধারার সঙ্গম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশ জুড়ে স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশত সমারোহ কার্যক্রম চলছে মহা আড়ম্বরে। স্থানে স্থানে নানাবিধ আকর্ষণীয় কার্যক্রমে সমাজের অসংখ্য মানুষ অংশগ্রহণ করছেন। সম্প্রতি কেরলের তিরুবনন্তপুরমে এই উপলক্ষে আয়োজিত একটি কার্যক্রমে আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাব-ধারার নেতৃবর্গের একত্র উপস্থিতি দেখা গেল। যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে অনেকে মনে করছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর আদর্শবাদের দ্বারা শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, সারা বিশ্বকে জয় করেছিলেন। স্বামীজীর চিন্তাধারার প্রভাব কেরলে আবার দেখা গেল 'স্বামী বিবেকানন্দ অ্যান্ড প্রবুদ্ধ কেরলম্'— পুস্তকের লোকার্পণ অনুষ্ঠানে। ১০১টি প্রবন্ধ ও কবিতার সংকলন গ্রন্থটি বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারীর অধ্যক্ষ তথা ভারতীয় বিচার কেন্দ্রের নির্দেশক ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক পদ্মশ্রী পি পরমেশ্বরণ সম্পাদনা করেন। লোকার্পণ কার্যক্রমটি ভারতীয় বিচার কেন্দ্র ও বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারীর মিলিত তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। পুস্তকটি লোকার্পণ করেছেন কংগ্রেস নেতা তথা কেরলের সংস্কৃতি মন্ত্রী ডঃ কে সি জোসেফ, কেরলের পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বি এস অচ্যুতানন্দ এবং পি পরমেশ্বরণ মিলিতভাবে। অনুষ্ঠানে পরমেশ্বরণজী বলেন, "স্বামীজীর হৃদয়ে কেরলের তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি গভীর প্রেম ছিল। এঁদের জীবনস্তর ঠিক করার জন্য স্বামীজী নানাবিধ কাজ করেছিলেন।"

অচ্যুতানন্দ

জোসেফ

পরমেশ্বরণ

অচ্যুতানন্দ বলেন, "স্বামীজী জাতিভেদ ও অন্য কুরীতি নির্মূল করার জন্য কঠিন প্রয়াস করেছেন। এই পুস্তক স্বামীজীর প্রতি সুন্দর শ্রদ্ধাঞ্জলি।" ডঃ কে সি জোসেফ বলেন, "গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতাগণ স্বামীজীর থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছেন। সেবা স্বামীজীর জীবন-উদ্দেশ্য ছিল। যুবসমাজের তিনি প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন।"

কার্যক্রমে রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী তত্ত্বরূপানন্দ মহারাজ, প্রাক্তন রাজদূত টি.পি. শ্রীনিবাসন, প্রাক্তন মুখ্যসচিব পি সি নায়ার, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও. রাজগোপাল, শঙ্করা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব কুলপতি ডঃ কে এস রাধাকৃষ্ণণ, প্রসিদ্ধ লেখিকা সুশ্রী সুগতা কুমারী, প্রফেসর বিষ্ণুনারায়ণ নম্বোদরী প্রমুখসহ বহুসংখ্যক বিদ্বজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন, পড়ান ও গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৩২৫.০০ টাকা
প্রতি কপি ৭.০০ টাকা

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

সারমেয় বিনোদন

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—'গন টু দ্য ডগস' অর্থাৎ গোল্লায় গেছে। কোন লোকজনের বদ সঙ্গে পড়া বা খারাপ হয়ে যাওয়া বোঝাতেই কথাটি ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি একটি ইংরেজী সংবাদের শিরোনামে এসেছে 'Israeli TV has gone to the dogs' না, ইসরায়েলের টি ভি গোল্লায় যায়নি আসলে তারা কুকুরদের দেখার উপযোগী একটি চ্যানেল চালু করেছে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের কুকুরপ্রেমীরা যখন তাঁদের পোষ্যটিকে বাড়িতে একেবারে একা রেখে যান বা যেতে বাধ্য হন, পশু মনোবিদরা তাদের ব্যবহারের মধ্যে একধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। অনেকেই সেই সময় বাড়ির টিভিটি কুকুরদের দেখার জন্য চালিয়ে দিয়ে যান।

চ্যানেলগুলির মধ্যে মূলত

'এনিম্যাল প্ল্যানেট' বা 'সি এন এল'। প্রথমটিতে অধিকাংশ সময়ই এক পশু আর এক পশুকে সংহার করছে। হয়ত-বা মেরে ফেলছে। দেখা গেছে সারমেয়রা এইসব দেখে খুবই মুষড়ে পড়ছে। অন্যদিকে সি এন এলের প্রদর্শিত হিংস্র দৃশ্যগুলিও তাদের ব্যবহারে পরিবর্তন আনছে। ইত্যাকার ব্যাপার মাথায় রেখেই ইসরায়েলের এই সংস্থা দাবী করছে এখন মালিকরা নির্লিপ্ত থাকতে পারেন তাদের প্রদর্শিত অনুষ্ঠান কোনওভাবেই কুকুরদের আতঙ্কিত, বিমর্ষ বা হিংস্র করে তুলবে না। থাকবে না কোনও হটাৎ চিৎকার। সংস্থার পক্ষে সি ই ও গিল্যাড নিউম্যান আরও জানান বাড়িতে পরিত্যক্ত থাকার হতাশা বা নিঃসঙ্গতার ক্লান্তি যা একা থাকা কুকুরদের নিত্যসঙ্গী তা থেকে তাঁদের সংস্থার অনুষ্ঠান নিশ্চিত ভাবে মুক্তি শুধু দেবে না এটি এমন বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পিত যে তাদের আনন্দ ও স্ফূর্তিও দেবে। থাকবে শান্ত সঙ্গীত ও কুকুরদের পচ্ছন্দসই রঙ। ইজারায়েলে ১ বছর ধরে অনুষ্ঠান চলছে। সারমেয় জিন্দাবাদ।

Sharada Travels

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

ভ্রমনসূচী–২০১৩

ভ্রমণ	মুখ্য দর্শনীয় স্থান	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য
গোয়া	উত্তর গোয়া, দক্ষিন গোয়া পালোলেম বীচ	৮	৮ই আগষ্ট,২০১৩	৬,৫০০/-
হরিদ্বার	হরিদ্বার,ঋষিকেশ,লক্ষ্মন ঝোলা মুসৌরী	৮	১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৩	৭,০০০/-
পুরী	ভূবনেশ্বর, নন্দনকানন, ধবলগিরি, খন্ডগিরি, লিঙ্গরাজ মন্দির, কোনারক	৬	১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০১৩	৩,৫০০/-
বেনারস	কাশীধাম, সারনাথ, বিন্ধ্যাচল, সিরসি ফলস্, উইলডম ফলস্	৭	২০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩	৬,০০০/-
আন্দামান	পোর্টব্লেয়ার, সেলুলার জেল, হ্যাভলক, বারাট্যাঙ্ক রোস আইল্যান্ড, রাধানগর সী বীচ,	৬	যে কোন সময়	৮,৫০০/- ও প্লেন ফেয়ার
সিকিম	গ্যাংটক, ছাঙ্গুলেক, বাবা মন্দিও, নামচি সান্দ্রুপচী, চারধাম, পেলিং	৮	যে কোন সময়	৭,০০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর চার মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস) লাক্সারী বাস/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ,ডিনার (আমিষ/নিরামিষ),টোল ট্যাক্স,গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

প্যাকেজে থাকছে না :- ট্রেন চলাকালীন কোন রকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া,ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে,হাতি/ঘোড়া চাপা, পুজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
8 April - 2013